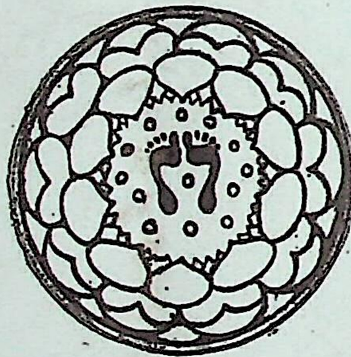
দান—পাঁচ টাকা

৭০ তম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ ১৪১৫

সঙ্ঘসাথী



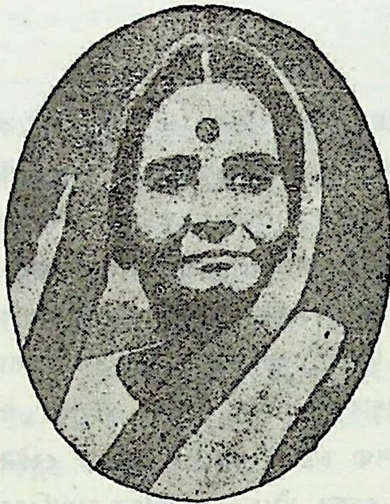
"ব্রহ্মচর্য্য সত্যনিষ্ঠা আছয়ে যাহার
সাধনার প্রয়োজন নাহিক তাহার।"

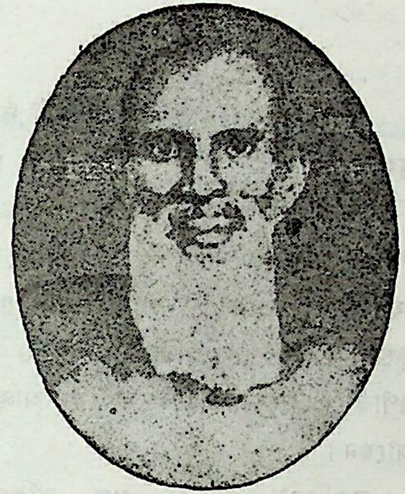
[সত্যের অনুশীলনার্থে শ্রীতারামঠ হইতে প্রকাশিত সত্যসঙ্ঘের মুখপত্র]

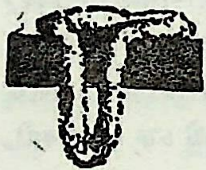
সম্পাদক :

সঙ্ঘপ্রাণ শ্রীমৈত্রেয় প্রতিম বড়ুয়া

সূচীপত্র







সঙ্ঘসাথী



"সত্যমন্ত্র হে মানব কর রে গ্রহণ, সত্যই মঙ্গলপ্রসূ শান্তির কারণ।"

সপ্ততিতম বর্ষ | শ্রাবণ ১৪১৫ | চতুর্থ সংখ্যা

অহঙ্কার

শ্রীতারাচরণ

নিন্দা অহঙ্কার করে যেই জন,
ইহ পরকাল হয় ঘৃণিত জীবন।
নিন্দাহঙ্কারে মানুষ কলুষিত হয়,
তত্রাপি নরকুলের শিক্ষা নাহি হয়।
নিন্দিত হইয়া লৌহ হল প্রশংসিত,
লৌহনিন্দায় স্বর্ণ হল কলঙ্কিত।

গর্ব্বহীন ব্যক্তি হয় জগতে পূজিত,
গর্ব্বিত মানব হয় ধরাতে ঘৃণিত।
গর্ব্বিত হইলে লোক শান্তি নাহি পায়,
গর্ব্বহীন ব্যক্তি হয় পূজিত ধরায়।
দম্ভেতে বিশ্বামিত্রের হইল পতন,
পুরাণে রহিয়াছে শত উদাহরণ।

কুলকুণ্ডলিনী

শ্রীঅনিল চন্দ্র দত্ত

গুহ্যদেশ থেকে দুই অঙ্গুলী উর্দ্ধে এবং লিঙ্গ মূল থেকে দুই অঙ্গুলী অধোদিকে চারি অঙ্গুলী বিস্তৃত মূলাধার পদ্ম রয়েছে। এই মূলাধার পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে অতি সুন্দর ত্রিকোণাকার যোনিমণ্ডল আছে। এই যোনিমণ্ডলের মধ্যে কুণ্ডলিনী শক্তির অধিষ্ঠান্। কুণ্ডলিনী শক্তি সর্পাকারে সুষুম্না নাড়ীর দ্বারকে আচ্ছাদিত করে আছেন।

কুণ্ডলিনী শক্তিই গুপ্ত বর্ণরূপা। তিনি শব্দাত্মিকা বাগ্‌দেবী। কুণ্ডলিনীকে মূলাধারে সুষুম্নাস্থলে আঘাত করলে অব্যক্ত নাদ থেকে বর্ণসকল ব্যক্তরূপে বহির্গত হয়। কুণ্ডলিনীই সুষুম্নাস্থিত প্রাণশক্তি। কুণ্ডলিনীকে ব্রহ্মশক্তি বা প্রকৃতিও বলা হয়।

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে :—

"যোগীনাং হৃদয়াম্ভোজে নৃত্যতী নৃত্যমঞ্জসা।
আধারে সর্বভূতানাং স্ফুরন্তী বিদ্যুদাকৃতি॥"

কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন প্রাণবায়ুর নিরোধের দ্বারা। প্রাণবায়ুকে নিরোধ করবার যে কৌশল ; তাহার নাম ক্রিয়া। এই ক্রিয়া করতে করতে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করা যায়। সর্পাকাররূপিণী মহাশক্তি কুণ্ডলিনীই প্রাণ। তিনি বায়বী শক্তি। প্রাণাদি বায়ুরূপে তিনি সর্বদেহে বিস্তৃতা। কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না ভেদ করে নিজ নিকেতনে সহস্রারে যখন প্রবেশ করেন, তখন বহুবিধ শ্রুতিমুখর নাদ শ্রুত হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তি গুহ্যদেশ থেকে উঠে ভ্রূমধ্যকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করে দক্ষিণ ও বাম সন্ধিস্থলকে স্পর্শ করে ধনুকাকৃতি হয়ে পুনরায় মূলাধারে মিলিত হয়েছে। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নানাড়ীকে যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী বলা হয়। এই তিনটি নাড়ী আজ্ঞাচক্র থেকে স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হয়ে মূলাধারে প্রবেশপূর্বক পুনরায় একত্র হয়েছে। এইজন্য আজ্ঞাচক্রকে মুক্ত ত্রিবেণী এবং মূলাধার চক্রকে যুক্ত ত্রিবেণী বলা হয়। ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত ও বিশুদ্ধ এই পঞ্চ চক্রকে ধনুকের ন্যায় বেষ্টন করে। আজ্ঞাচক্রের নীচে ভ্রূর সন্নিহিত নাসাবিবর পর্যন্ত গিয়ে সুষুম্নার সহিত মিলিত হয়েছে। ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী আছে, তাহারই ছয় গ্রন্থিতে মূলাধার চক্র থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত পদ্মাকার ছয়টি চক্র ও ডাকিণী, কাকিণী, লাকিণী, রাকিণী, ও শাকিণী নামে ছয়টি শক্তি আছে। কুণ্ডলিনী শক্তি ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া—এই তিনটি নামে বিভক্ত হয়ে শরীরে চক্রে চক্রে ভ্রমণ করেন। কুণ্ডলিনী শক্তিই আমাদের জীবনী শক্তি। কুণ্ডলিনী শক্তিই জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ। কুণ্ডলিনী অর্থে কুণ্ডস্থিত বা কুণ্ডাশ্রিত শক্তি। কুণ্ড মানে আধার। শক্তি যখন আধারে থাকে বা অবলম্বন করে থাকে তখন সেই শক্তিকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলা হয়। কুণ্ডলিনী শক্তির সুপ্তাবস্থা। যখন শক্তি শিবকে বা শূন্যকে অবলম্বন করবে অর্থাৎ নিরাশ্রিত বা নিরাবলম্ব হ'বে, তখন কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়েছে বুঝতে হ'বে।

কুণ্ডলিনী শক্তিই বাক্য জননী ও শ্বাস প্রশ্বাস বিধাত্রী। সাধনার উদ্দেশ্যই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করা এবং তাহার জন্য প্রাণায়ামাদি ক্রিয়া বিহিত আছে।

বক্তা রবীন্দ্রনাথ

গোপালচন্দ্র রায়

কারও অনুরোধে বা আদেশে কোন সভায় বা জন সমাবেশে কিছু বললে তাকে সাধারণতঃ বক্তৃতা বলা হয়। এমনি আবার কেউ কোথাও সম্বর্ধিত হলে, তিনি তখন সম্বর্ধনার উত্তরে যা বলেন তাকেও বক্তৃতা বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এইরূপ কত শত বক্তৃতা দিয়েছেন। এখানে তার মাত্র কিছুর উদাহরণ দিচ্ছি।

১২৮৮ সালের ৮ই বৈশাখ (১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল) কলকাতার বেথুন সোসাইটি আয়োজিত কলকাতা মেডিকেল কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এইটাই রবীন্দ্র-জীবনে প্রথম বক্তৃতা বা লিখিত ভাষণ।

সেদিন সভায় সভাপতি ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির বক্তৃতার বিষয় ছিল—'সংগীত ও অনুভূতি।' কবি নিজে গান গেয়ে তাঁর বক্তৃতার বিষয় বস্তু শ্রোতাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২০ ও পুর্ণ হয়নি।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সভাপতি দাদাভাই নৌরজী। এই কংগ্রেস সভায় উদ্বোধন সংগীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।'

এই গানটি গাওয়ার পর সভার কাজ আরম্ভ হয়।

১৮৮৬ সালেই রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালের অনুরোধে "হিন্দু বিবাহের আদর্শ" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করে Indian Association For the Cultivation of Science হলে পড়েন। সেদিন এ সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার।

১৮৯২ সালে নাটোরে এক সভায় শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলার জন্য রবীন্দ্রনাথকে সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বন্ধু নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করেন, সেদিন রবীন্দ্রাথ সেই সভায় "শিক্ষার হেরফের" নামে এক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন পরে সে প্রবন্ধ 'সাধনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমোহন বসু, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধ সমর্থন করেছিলেন।

বিখ্যাত সাংবাদিক তারিণীশংকর চক্রবর্তী তাঁর 'বক্তা রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিখেছেন—

'ইংরেজ ও ভারতবাসী' নামে সর্ব প্রথম এক রাজনৈতিক প্রবন্ধ কবি চৈতন্য লাইব্রেরী হলে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পাঠ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন।' পৃঃ—৫

তারিণীশংকর বাবুর এ লেখাটা কিন্তু ঠিক নয়। এতে একটু ভুল আছে। ভুলটা হ'ল—বঙ্কিমচন্দ্রের সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধ পাঠের সভাটা হয়েছিল 'জেনারেল এসেম্বলীর (বর্তমানের স্কটিশ চার্চ কলেজ) হলে। সে দিনের সেই সভার কথা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মশায়ের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

মোগল-কুল-তিলক আকবর শাহকে আমরা সম্রাট শিরোমণি বলিয়া জানি। বাল্যকাল হইতে

শিক্ষাসূত্রে আকবরের বিবিধ গুণমণ্ডিত দিল্লীর মোগল দরবারকে সম্মানের চোখে দেখিয়া থাকি। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে জেনারেল এসেম্বলীয় হলে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ শ্রবণের প্রলোভন-তাড়িত জনমণ্ডলীর মজলিসে বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতি। সে সময়ে বঙ্কিমবাবু সবেমাত্র রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সভা-সমিতিতে যাতায়াত তাঁহার বড় বেশি অভ্যাস ছিল না। বিশেষতঃ সেকালের রবীন্দ্র-সম্মেলন যে কি বিরাট ব্যাপারে পরিণত হইত, তাহা তাঁহার জানা ছিল না। যাহা হউক, দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠাগত প্রাণ সেই বিরাট জনমণ্ডলীর সম্মুখে রবীন্দ্রের প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র সভাপতির কার্য সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে প্রবন্ধের শিরোনাম মনে নাই, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে মোগল শাসনের উল্লেখ ছিল এবং আকবরের প্রশংসাও ছিল।...

উপরে কথিত সভার পরদিন প্রাতঃকালে আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। আমাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—আপনি কাল আমায় খুব ঠকিয়েছেন। এত লোকের জনতা হবে জানলে কি আমি যেতুম। আমি মনে করেছিলুম ডিবেটিং ক্লাবের মত অল্প লোক হবে, সেখানে রবিবাবু প্রবন্ধ পড়বেন। বরং আমি দু দশ কথায় আমার বক্তব্য শেষ করব। এ কি ভয়ানক বিরাট ব্যাপার। আমাদের দেশে মিটিংগুলি কি ঐ রকমই হয়? এই 'ঐ রকম' কথার অর্থ এই যে, সেদিন গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে জেনারেল এসেম্বলীর স্বল্পায়তন হলে লোকে লোকারণ্য, বিদ্যালয়ের ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের শিক্ষিত গণ্যমান্য সাহিত্যিকগণ উপস্থিত।... আমি পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ভাগ্যে আপনি সে বিরাট গোলটা থামাইতে পারিয়াছিলেন, তাই কাল মান বাঁচাইয়া বাড়ি আসিয়াছি।'

'রবীন্দ্র জীবনী' লেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র জীবনী গ্রন্থে লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রবন্ধ পাঠের সভা হয়েছিল চৈতন্য লাইব্রেরীতে। কিন্তু সভায় অংশগ্রহণকারী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে সভা হয়েছিল জেনারেল এসেম্বলীতে বা বর্তমানের স্কটিশ চার্চ কলেজে।

অতএব বিদ্যাসাগরের জীবনীকার চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনাটাই ঠিক।

এলাহাবাদের ১৫ বি এড্‌মনষ্টন রোড থেকে প্রকাশিত সাংবাদিক তারিণীশংকর চক্রবর্তীর 'বক্তা রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি বই আছে।

শান্তিনিকেতনের এক সময়ের অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর 'রবিচ্ছবি' গ্রন্থে 'মৌখিক ভাষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনেক মৌখিক অভিভাষণের কথা রয়েছে।

কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি ডিরেকটর শিশির কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আমার কণ্ঠ হতে' নামে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার একটা সুদীর্ঘ তালিকা আছে। শিশিরবাবুর এ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকায়।

এ ছাড়া রবীন্দ্র-সংক্রান্ত বহু বইয়ে রবীন্দ্রনাথের নিজের চিঠিপত্রে তাঁর অনেক বক্তৃতার কথা আছে যা উল্লেখ থাকলেও তা সংগৃহীত হয়নি বা সে সব বক্তৃতার কথা কিছুই জানা যায়নি।

যেমন—ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটা চিঠি আছে। চিঠিটিতে চিঠি লেখার তারিখ নেই। তবে চিঠিতে ছিল—পোষ্টমার্ক বড়বাজার ২৮/৯/১৯০৯। এই চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ চারুবাবুকে লিখেছিলেন—

'দেদার বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছি। প্রাণ বেরিয়ে গেল। এখনি এক বক্তৃতা অভিযানে চলেছি।'

রবীন্দ্রনাথের এই দেদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্র জীবনী' ২য় খণ্ড গ্রন্থে ২৭৬ পৃষ্ঠায় পাদ টীকায় জানিয়েছেন দেদার বক্তৃতার তালিকা পাই নাই।

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর চার খণ্ড রবীন্দ্র জীবনী গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের যে বক্তৃতার কথা দিতে পারেন নি, শিশিরবাবুও রবীন্দ্রনাথের সে বক্তৃতার কথা উল্লেখ করতে পারেন নি, যেমন—

রবীন্দ্রনাথ ১৩২২ সালের ৬ই ভাদ্র (১৯১৫র ২৬শে আগষ্ট) তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

ওঁ

মীরু,

···কাল আনন্দ মোহন বসুর মৃত্যু বাসরের স্মরণ সভায় আমাকে বোলপুর থেকে টেনে নিয়ে এল। ওভারটুন হলে সভা -ঠাসাঠাসি লোকের ভিড় - দরজা ঠেলাঠেলি মহামারি গোল মাল - কি ভাগ্যি আমার বক্তৃতার সময় চুপচাপ ছিল—কিন্তু এই ভাদ্র মাসের গরমে দেড় ঘন্টাকাল কি করে যে এই ভীড় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অসহ্য কষ্ট স্বীকার করল আমি ভেবে আশ্চর্য হই।

শিশির কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আমার কণ্ঠ হতে' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এ বক্তৃতার উল্লেখ নেই। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের এ বক্তৃতার কথা প্রভাত বাবুর বইয়ে নেই।

শিশির কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আমার এ কণ্ঠ হতে' প্রবন্ধের কথা, এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য বক্তৃতার কথা পরে পরে ক্রমশঃ প্রকাশ করব।

(ক্রমশঃ)

প্রকৃতি ও মানব মনের বিচিত্র রহস্য কেন্দ্রিক কবিতা 'বর্ষামঙ্গল'

শ্রীসত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

"কল্পনা" কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঋতুর বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাব্যে সব ঋতুর কথা বর্ণিত হলেও প্রিয় ঋতু রূপে উঠে এসেছে দুটি। একটি বর্ষা অন্যটি বসন্ত। এই দুটি ঋতুর শুধু অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, আনন্দ মাধুর্য্যের নির্যাস ক্ষরিত হয় ঝুলন ও দোল উৎসবের মাধ্যমে। তাই প্রাকৃতিক পটভূমি, পরিবেশ আর একই সাথে মানব মানবীর বিচিত্র হৃদয় রহস্য প্রকাশিত হয়েছে এই দুটি ঋতুতেই।

আবার বিস্ময় বিচারে ও অনুভবের ক্ষেত্রে বর্ষা হল বিরহের আর বসন্ত হলো মিলনের ঋতু। কবির কাব্যের যা কিছু রস নিবেদন তার মূল আধার এই দুটি অনুভূতির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ।

সেই দিক থেকে বিচার করলে ১৩০৫ সালের আষাঢ় মাসে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত বর্ষামঙ্গল কবিতাটি একটী ভিন্ন স্বাদের দ্যোতনা প্রকাশ করে। এই কবিতায় যে ছন্দ প্রযুক্ত হয়েছে তা মধ্যলয়ে। বর্ষার ঘনঘটার আকাশ জুড়ে ব্যাপ্তি, তার আগমন ও তার ফলে চার পাশের অনুভবের বদল ঋক্ বেদের যুগ থেকে যেভাবে অনুভূত ও চিত্রিত হয়েছে অথর্ব বেদে—কালিদাসের ঋতু সংহারে মেঘদূতে, জয়দেবের গীত গোবিন্দে, বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীতে, গুজরাটের সঙ্গীতে সে ভাবে অনুরণিত হয়েছে এবং তারই এক সমন্বয়ী অনুভব ধ্বনিত হয়েছে বর্ষামঙ্গল কবিতায়।

প্রথম স্তবকেই রয়েছে বর্ষার আগমন এবং তার অপূর্ব রূপ বর্ণনা। ভারতের সব দেশের, সব কালের বর্ষার গানের মধ্যে যে মধুরিমা আছে তারি সার কথা যেন রয়ে গেছে বর্ষার এই মঙ্গল গাথায়। কবিতার শুরুতেই তার আগমনী।

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।"

সেই আনন্দে ভৈরব রূপে কিন্তু ভৈরবের বিধ্বংসী মূর্তি বৈশাখের মত আর এখানে নেই—ক্ষিতির উপর জলসিঞ্চন করে শুষ্ক মৃত্তিকায় অপরূপ সোঁদা ঘ্রাণ জাগিয়ে আসছে। কবিতাকে বলেছেন নবযৌবনা। আবার সে চপলও নয়, শ্যাম গম্ভীর। কিন্তু গাম্ভীর্য্যের মধ্যে যে রূঢ়তা আছে তা তার মধ্যে নেই। কারণ সেই গাম্ভীর্যের আবরণ সরস আবরণের দ্বারা ঢাকা।

নব যৌবনা বর্ষার আগমনে প্রকৃতি জগতে যে পরিবর্তন জেগেছে সেই পরিচয় দিতেও কবি ভোলেন নি। মেঘের ডাক শুরু হতে না হতেই অরণ্য উঠেছে শিউরে। ময়ূর তার কলাপ দিয়েছে মেলে।

"গুরু গর্জনে নীল অরণ্য শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে"।

মত্ত বর্ষার আগমনের সাথে সাথেই মানব জগতে দেখা দিয়েছে প্রতিক্রিয়া, মেঘদূত কাব্যের পূর্ব মেঘে, মেঘের আকস্মিক আগমনে এবং বিদ্যুৎ চমকে চকিত হয়ে উঠেছে অভিসারিকা রমণী। ঋতুসংহার কাব্যে বর্ষা অংশে কালিদাস দিয়েছিলেন অনুরূপ একটি বর্ণনা।

কবি যেন প্রবেশ করে যান সেই সব অভিসারিকার অন্তরের অন্দরে। ঋতু সংহারে আছে রমণীর শিরে বকুল মালা এবং মালতী মালার কথা। অভিসারিকার বিদ্যুতের আলোয় দেখে দেখে পথ চলার কথা—আছে সেখানে। আছে সুন্দর ছন্দ—অলংকার সহকারে বর্ণনা। অভিসারিকা বর্ষার দিনে চলে আসে কুঞ্জে। রাধাকৃষ্ণের অপূর্ব লীলায় বারংবার এসেছে এই অভিসারে ব্যাকুল চলার কথা। রাধার বসন নীল। আকাশের মেঘের নীলিমা, মন আর বসে নেই যে। জ্ঞানদাস লিখেছেন "চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরাণ সহিত মোর" এটী রবীন্দ্রনাথেরও একটী প্রিয় পঙ্‌ক্তি। তাই তিনি নায়িকাকে আহ্বান জানানোর সময় স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছেন—এসো ঘন বনতলে এসো ঘন নীল বসনা।

"বর্ষামঙ্গলে" আর একটী চিত্র ফুটে উঠেছে সেটী একটি অপূর্ব চিত্র—যাহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে নব অনুরাগিনী শকুন্তলার প্রেমের প্রতিভাস। একই সংগে গীত ও গোবিন্দের রাধা কৃষ্ণের লীলায় একটা রূপ মূর্চ্ছনায় মৃদঙ্গ, মুরজ, মুরলী, শঙ্খ এবং মিলনের উলুধ্বনির উল্লেখ। কুঞ্জ কুটিরের আগমন প্রভৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভূর্জ পাতায় নবগীত রচনার কথা কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে রয়েছে। আবার পদ্ম পত্রে পত্র লিখনের প্রসঙ্গ আছে শকুন্তলায়। নব অনুরাগিণী শকুন্তলার অনুভব চিরকালের জন্য ধরা রয়েছে এই সব রচনায়। কিন্তু অভিসারে যাওয়া বললেই তো যাওয়া হয় না, যাওয়ার জন্য প্রয়োজন প্রস্তুতি। সাজিয়ে নিতে হয় নিজের দেহকে, পড়তে হয় নয়ন শোভন বসন। চোখে দিতে হয় রমণীয় কাজল। কবি লিখেছেন, "কেতকী কেশরে কেশ পাশ কর সুরভী, / ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পর করবী, / কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে / অঞ্জন আঁকো নয়নে।"

মনের আনন্দকে মিলন প্রয়াসে নারী প্রকাশ করে তার হাতের কঙ্কন বাজিয়ে পোষ্য শিখিকে নৃত্য করিয়ে। ঋতুসংহার কাব্যে এই ময়ূরের নৃত্যের কথা। আবার মেঘদূত কাব্যের উত্তর মেঘে শিখিকে নৃত্য করাতে গিয়ে রমণীর হাতের বালার যে অনুরণন উঠেছে তা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেঘদূত অনুবাদে চমৎকার ভাবে ধরা রয়েছে—"তাহারে নাচায় প্রিয়া করতালি দিয়া দিয়া রনরন বাজে তায় বলিয়া।"

প্রস্তুতি শেষ হবার পর পথে বেরিয়ে আসার কথা। কিন্তু আকাশে কাজল ঢালা মেঘ। বিদ্যাপতি লিখেছিলেন 'বর্ষান্ কাজের বশ"। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে অনুসন্ধান নেন নি। তিনি বলেছেন মেঘাবৃত হওয়ার কারণে শশী তারা-হীনা অন্ধ তামসী যামিনী "ঋতুসংহার" কাব্যে রয়েছে এর আভাস—"অন্ধ করী কৃত শর্বরী স্বপি"। পথে বেরিয়ে আসে অভিসারিকা তার চোখে পড়ে গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ। পথ জনহীন ক্ষুব্ধ প্রাণে যেন কেঁদে ফিরছে যেখানে কোন গৃহে একাকী শুয়ে রয়েছে পুরকামিনী নিদ্রাহীন অবস্থায়। যূথি পুষ্পে সুগন্ধ সজল সমীর মিশে আসছে কাছে। শোনা যাচ্ছে দাদুরীর একটানা স্বর। এ রকম একটি রাতকে সহজে ভোলা যায় না।

অভিসার সমাপ্তিতে আসে মিলনের প্রসঙ্গ। আর বর্ষার সে মিলন ঝুলনের মধ্যে তার শেষ। তাই কবি বলেছেন নীপ শাখে বাঁধ ঝুলনা। বৃক্ষের শাখায় বাঁধা দোলনায় যখন দুলতে থাকে তারা তখন বৃক্ষ থেকে ঝুলে পড়বে কুসুম পরাগ। এ মিলন অনুপম। কালিদাসের কাব্যে আছে বর্ষার বিরহের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে বেঁধেছেন মিলনের আনন্দে। তার পরিচয় পাই কবির বর্ষামঙ্গলে। তিনি জানিয়েছেন সুপ্রাচীন কাল থেকে অসংখ্য কবি বর্ষা প্রকৃতিতে নর নারীর মিলনের অনুভূতিকে রেখেছেন গেঁথে। তার যে সৌরভ তা কোনো মতেই বর্ষা প্রকৃতির সৌরভের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয় কেননা তা চিরকালের মানুষের চিরদিনের মিলনের আনন্দসুধায় ভরা :—

"শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে
ধ্বনিয়া তুলিছে মত্ত মদির বাতাসে
শতেক যুগের গীতিকা
শত শত গীত মুখরিত বন বীথিকা।"

কালিদাসের মত রবীন্দ্রনাথও ভাবতেন বর্ষা বিরহের ঋতু। তার বহু রচনায় একথায় বারং বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

কিন্তু লক্ষ্যনীয় "কল্পনা" কাব্যের এই কবিতাটির নাম বর্ষা নয়। "বর্ষামঙ্গল"। তাই এ কবিতার শেষ অংশে কবি চিত্রিত করেছেন মানব মানবীর চিরন্তন মিলনকে। বর্ষার আগমন থেকে শুরু করে তার রূপ নরনারীর হৃদয়ে তার প্রতিক্রিয়া, মিলনের অভিলাষ, পথের দুর্দৈবকে স্বীকার এবং শেষে প্রিয় মিলনের অভিচ্ছিন্ন আনন্দ, বর্ষামঙ্গল কবিতাটিকে এক স্বতন্ত্র মাত্রা এনে দিয়েছে। এইভাবে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথের মানস পটে বর্ষা ঋতুর প্রভাব। এই ভাবেই আমরা উপলব্ধি করি কবি কিভাবে সাড়া দিয়েছেন।

॥ হিন্দী থেকে অনুবাদ ॥

॥ রাখী বন্ধন ॥

মূল হিন্দী লেখকের নাম অপ্রকাশিত

বাংলা অনুবাদ—**শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ**

[হিন্দী দৈনিক পত্রিকা 'সন্মার্গ'; কোলকাতা, রবিবার, ২৬শে আগষ্ট ২০০৭ সাল।]

কোন সভ্য মানুষ একা থাকতে পারে না। সে সামাজিক প্রাণী। একটি প্রাচীন সুনিয়ন্ত্রিত সুগঠিত সমাজ জীবনে বহু ধরণের—সর্বজনমান্য বিধি নিষেধ আচার আচরণ, কার্য্যকলাপ থাকে। এক একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষদের পারস্পরিক বোঝাপড়াযুক্ত সম্বন্ধ রূপ সুতো দিয়েই সেই সেই গোষ্ঠীর সমাজ রূপ বস্ত্রটি বোনা হয়।

কেবলমাত্র রক্তের সম্পর্ক অথবা সামাজিক সম্পর্ক থেকে সত্যকার সম্বন্ধ তৈরী হয় না; স্থায়ী সম্বন্ধ তৈরী করতে হলে চাই পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ এবং গভীর হার্দিক আকর্ষণ। ঘৃণা, লোভ, স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ একটি মানুষকে অপর এক মানুষ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ঐ সব রিপু সমাজ-জীবন গঠনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্রতিটি সম্বন্ধই দ্বিপাক্ষিক। সম্বন্ধকে অটুট রাখার চেষ্টা দু'পক্ষকেই করে যেতে হবে। সমাজের রাখীবন্ধন-উৎসবের রাখীর সুতোর একপ্রান্ত থাকে ভাই-এর হাতে আর এক প্রান্ত থাকে বোনের হাতে। রাখীবন্ধন-উৎসব হলো একটি ধার্মিক, সাংস্কৃতিক মূল্যযুক্ত সামাজিক উৎসব। এই উৎসবে বোন কিছু অর্থবহ শব্দ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এবং ভাই-এর হাতের কব্জীতে রাখী বেঁধে দিয়ে ভাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখার চেষ্টা করে। 'রক্ষা-বন্ধন' বা রাখী উৎসবের মধ্য দিয়ে বোন তাকে রক্ষা করার আবেদন ভাই-এর মনে পৌঁছে দেয় এবং ভাই তার বোনের আবেদনের মর্য্যাদা রাখার চেষ্টা করে।

রাখীবন্ধন-উৎসব কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে শুধুমাত্র ভাইবোনের উৎসব ছিল না ; এই রক্ষা কবচকে তখন বলা হতো জীবনের কবচ, শক্তির কবচ। দেবী দূর্গাও এই কবচ বেঁধে যুদ্ধ করে দেবতাদের জয়ী করেছিলেন। দেবী পুরাণে এই রক্ষাসূত্রকে 'শক্তিসূত্র' অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, এটি সর্বদা প্রাণীদের রক্ষা করে। 'শ্রীদুর্গা সপ্তশতী'তে সমস্ত প্রাণীকে রক্ষা করার শক্তিযুক্ত 'দেবী কবচে'র কথা বলা হয়েছে। দ্বাপর যুগে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রমাগত বস্ত্র সরবরাহ করে তাঁর সম্মান রক্ষা করেছিলেন। কারণ দ্রৌপদী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীসমা। উভয়ের ভিতরে ছিল রক্ষা সূত্রের বন্ধন।

ভগবান 'শ্রীবিষ্ণু' ত্রিভুবনবাসীর নিকট রক্ষা করার বচনে আবদ্ধ ছিলেন ; বামনাবতার রূপে তিনি তাঁর বচনকে কার্যকর করেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

"যেন বদ্ধো বলি রাজা দানবেন্দ্রো মহাবল
তেন ত্বাং প্রতিবদ্ধামি রক্ষে মাচল মাচল।"

—এই শ্লোকটি হলো একটি মন্ত্র। রাখীবন্ধন উৎসবের পূজার্চনায় এই মন্ত্রটি জপ করা হয়। এই মন্ত্রে বলা হয়েছে—"আমি তোমাকে রক্ষাসূত্র দ্বারা সেইভাবে বাঁধবো—যে ভাবে শ্রীভগবান রাজা বলিকে বেঁধেছিলেন।"

'রক্ষাসূত্র' আসলে 'ব্রহ্মসূত্র'। ভগবান শংকর-সৃষ্ট এই ব্রহ্মসূত্র দ্বারা কাউকে বেঁধে রাখার শক্তি অর্জন করা যায়।

অরবিন্দানুসারী রবীন্দ্রনাথ

ড. শ্রীমতী সুনন্দা সান্যাল

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এরপর ১৯২৮ সালে মে মাসে কবি চলেছেন কলম্বো। পথে পণ্ডিচেরী বন্দরে কবির জাহাজ থামল। কবি শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎপ্রার্থী—খবর পাঠালেন। বছর দুয়েক আগে থেকেই শ্রীঅরবিন্দ একান্তবাসী, নিজ তপস্যারত। বছরে তিনদিন দর্শন দেওয়া ছাড়া কারো সঙ্গে দেখা করেন না। নিয়মভঙ্গ করে কবিকে ডেকে পাঠালেন সাক্ষাতের জন্য। শ্রীমা ছাড়া সে সাক্ষাৎকারে (২৯.৫.১৯২৮) আর কেউ উপস্থিত ছিলেন না। শোনা যায় কবি তাঁকে পাশ্চাত্য জগতে তাঁর আত্মার বাণী শুনিয়ে আসতে অনুরোধ করেছিলেন—অরবিন্দ বলেন পাশ্চাত্য জগৎ যদি চায় তবে সেই আসবে তাঁর কাছে। এই সাক্ষাতে কবি এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে জাহাজে (শান্তিলি) ফিরে কারও সঙ্গে কথাও বলতে পারেন নি—কেবল লিখে গিয়েছেন এই অভিজ্ঞতার কথা। ইংরাজী ও বাংলা দুভাষাতেই লেখা হয়েছিল। ছাপা হয়েছিল Modern Review (July, 1928) এবং প্রবাসীতে (শ্রাবণ, ১৩৩৫, পৃঃ ৫০৫) [(র.র. সুলভ সং ১৮, পৃঃ ৮৬)] বহু কথিত বহু পঠিত সেই লেখাটি অরবিন্দ সম্পর্কে কবির পুনর্দশন। "অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম, সেখানে তাঁকে জানিয়েছি—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে,

অপ্রগল্‌ভ স্তব্ধতায়—আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।"

১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে দিলীপকুমার রায় পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদানের আগে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রার্থী হন। কবি তাঁকে যে কবিতাটি লিখে দেন সেটি একটু দেখি—"আশিস তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া / প্রভাত সূর্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরি তপস্বীর / নিরন্তর করুণার বিগলিত আশীর্বাদ নীর তোমারে দিতেছে প্রাণধারা……"। শান্তিনিকেতনে কবি নিশিকান্ত কবিগুরুর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন। কিন্তু নিশিকান্তের অন্তর্গহনে তখন ডাক এসে পৌঁছেচে শ্রীঅরবিন্দের। কবিগুরু যে দামাল ছেলেটিকে কিছুতেই বাগ মানাতে পারছিলেন না, তাকে যখন শান্তশিষ্ট ছেলেটি হয়ে চরণাশ্রিত হয়ে তন্ময় হয়ে অপরূপ আধ্যাত্মিক কবিতার স্রষ্টা হয়ে উঠতে দেখছেন তখন কবি দিলীপ কুমারকে পত্রে লেখেন—"নিশিকান্ত তোমাদের ওখানে গেছে এতে আমি খুব খুশী হয়েছি। ওর মধ্যে প্রতিভা প্রচ্ছন্ন আছে—শিক্ষা ও সাধনার অভাবে তার প্রকাশ এলোমেলো হচ্ছিল।" নিশিকান্ত নাকি বলেছিলেন তিনি যখন শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে আসেন, কবিগুরু তাঁকে বলেছিলেন যেদিন দেখেছি তুই অরবিন্দ ঘোষের বই পড়ছিস সেই দিনই বুঝেছি তুই আমার হাতের বাইরে চলে গেছিস। কবি স্নেহধন্যা গায়িকা সাহানা দেবী কবির আশ্রম ছেড়ে ঋষির আশ্রয়ে সাধিকা রূপে জীবনে শান্তি লাভ করেছেন। কবি বলছেন…"কখনো কখনো ভ্রমক্রমে সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে আমার কাছে জিজ্ঞাসু এসেছেন, আমি অনেকবারই শ্রীঅরবিন্দের কাছে তাঁদের পথ নির্দেশ করেছি। কখনও কখনও বিদেশী লোকের সম্পর্কেও এরকম ঘটনা ঘটেছে।"

আপাত দৃষ্টিতে অরবিন্দের সহিংস বিপ্লব চিন্তা রবীন্দ্রনাথের সমর্থন না পাবারই কথা। কারামুক্তির পর তিনি পণ্ডিচেরীচলে এসে অন্তরালবাসী হয়েছেন। আরেক দিকে শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংস্কৃতির বার্তা আদান প্রদান করেছেন—বৃহৎ কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। ভিন্ন কর্মক্ষেত্রে কর্মব্যস্ততায় উভয়ের মধ্যে বহুদিন প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন। ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালে ঘরে বাইরে উপন্যাসের সন্দীপ চরিত্র সম্বন্ধে একটি আলোচনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ Modern Review পত্রিকায় (Jan. 1920) একটি খোলা চিঠি লেখেন—"...Aurobindo Ghosh does not belong to the same type of humanity as Sandwip of my story · I do not even to this day definitely know what is the political standpoint of Aurobindo Ghosh. But this I positively know that he is a great man, one of the greatest we have, and therfore liable to be misunderstood even by his friends, what I myself feel for him is not mere admiration but reverence for his depth of spirituality, his largeness of vision and his literary gifts, extraordinary in imaginative insight and expression. He is a true Rishi and a Poet combined, and I still repeat my namaskar which I offerred to him when he was first assailed by the trouble which made him an exile from the soil of Bengal." শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে তাঁর ভুল ধারণার তীব্র প্রতিবাদ করে আরও একটা চিঠিতে কবি দিলীপকুমার রায়কে লিখছেন—"…আজ এই চিঠি লিখছি তার একমাত্র কারণ শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা বহন করি এই মিথ্যা উক্তিকে নীরবে অগ্রাহ্য করা আমি অন্যায় মনে করি।

…তিনি (ম—বাবু) যদি মনে করে থাকেন শ্রীঅরবিন্দের উপর আমি ঈর্ষা প্রকাশ করেছি সে আমার দুর্ভাগ্য। রবীন্দ্রনাথের এ পত্রের উত্তরে দিলীপ কুমার লিখছেন—"…শ্রীঅরবিন্দ দুঃখিত হবেনই আপনার মনে বাজলে আমাদের কোনও ব্যবহারে। …শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছেন **'Let him have a peaceful sunset.'** আপনার প্রতি তাঁর স্নেহ কত অকৃত্রিম আপনি জানেন না। অনিলবরণ আপনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করাতে তিনি অনিলবরণকে বারণ করেছিলেন।"

এই সমকালীন দুই মহামনীষীর উভয়ের মনে উভয়ের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভাব ধারণ য বারংবার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে প্রকাশিত হয়েছে সর্বসাধারণের সম্মুখে তাও মাঝে মাঝে বিস্ময়ের উল্লেখ করে। উভয়েই উভয়কে ঋষি এবং কবি বলে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। তবুও রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবিই এবং শ্রীঅরবিন্দ মূলতঃ ঋষিই। অথচ বাল্যকাল দুটি লক্ষ্য করলে বিপরীত চিত্রটিও সম্ভাব্য ছিল মনে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পরিবারে যে ধর্মে হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা আর তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা ছাড়া বাকী প্রায় সবটুকুই গৃহীত। জন্মের সময়েই পিতা দেবেন্দ্রনাথ মহর্ষি নামে খ্যাত। সংসার আশ্রমের চেয়ে নির্জনবাস পার্থিব জগতের চেয়ে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ তাঁর অভ্যাস। কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় প্রায় অনাদরেই রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় তীব্র অনাগ্রহ। এঁর পক্ষে ঋষি হওয়া অবাস্তব ঠেকে না। আবার অরবিন্দ মাত্র সাত বছর বয়সে প্রেরিত হচ্ছেন ইংলণ্ডে; পাদরীর বাড়ীতে থাকছেন, সাহেবী ভাবাপন্ন পিতার ইচ্ছায় একুশ বছর বয়সে দেশে ফেরার আগে বাংলাও জানেন না ভাল করে। স্কুলে কলেজে অত্যন্ত কৃতী। শৈশবাবধি কবিতা লেখায় সিদ্ধহস্ত (রবীন্দ্রনাথ মানসীর আগের কবিতা গুলিকে প্রয়াস মাত্র বলছেন)। এঁর পক্ষে ভারতীয় যোগী হওয়ার চেয়ে সাহেবী কবি হওয়াই স্বাভাবিক মনে হতে পারে। তবু স্বীকৃতি পেলেও রবীন্দ্রনাথ বারবার বলছেন—"একটি পরিচয় আমার আছে আমি কবিমাত্র। …আমি তত্ত্বজ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞানী, গুরু বা নেতা নই." (২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮—সত্তর বছর পূর্তি উৎসব) এর দুদিন আগে রচিত পান্থ কবিতায়ও কবি এই কথাটিই বলেছিলেন "শুধায়ো না মোরে তুমি মুক্তি কোথা, মুক্তি কারে কই / আমি ত' সাধক নই, আমি গুরু নই। / আমি কবি আছি ধরণীর অতি কাছাকাছি—" দিলীপ কুমারকে চিঠি লিখেছেন—"…আমি নিজেকে সাধক বলে কল্পনাই করিনে। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে আমার অধিকার নেই, একথা আমি নিশ্চিত জানি এবং কাউকে ভুল জানাইনে। আবার জীবনের যা কিছু অভিজ্ঞতা তার উর্দ্ধেও উপলব্ধির ক্ষেত্র আছে, কিন্তু সেখানে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান পৌঁছয় না। আমার মন appearance এর সীমার মধ্যেই সঞ্চরণ করে আনন্দ পায়।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ১৯৪২ সালে শ্রীঅরবিন্দ একটি পত্র লেখেন দিলীপ কুমারকে চিঠিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "Tagore has been a wayfarer towards the same goal as ours in his own way—that is the main thing, the

exact stage of advance and putting of the steps are minor matters. His exact position as a poet or a prophet or anything else will be assigned by posterity and we need not be in haste to anticipate the final verdict the immediate verdict after his departure or soon after it may very well be a rough one,—for this is a generation that seems to take a delight in trampling with an almost Nazi rudeness on the body of the ancestors, specially the immediate ancestors ...But these injustices of the moment do not endure, in the end a wise and fair estimate is formed and survives the change of time.

Tagore, of course belonged to an age which had faith in its ideas and whose very denials were creative affirmations. That makes an immense difference. Your strictures on his later developement may or may not be correct but this mixture even was the note of the day and it expressed a tangible hope of fusion into something new and true—therefore it could create..." কবির মৃত্যুর ষাট বছরের চেয়ে বেশী পরে আজ আমরা সেই **wise and fair estimate** টুকু দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি দেশে বিদেশে আজও কত পীড়িত মানুষ আশ্রয় লাভ করছে তাঁর চিন্তার সান্নিধ্যে।

কবির শেষ জীবনের কবিতার এই **later development** তাঁর সারাজীবনের কাব্য কৃতির সরলরৈখিক দীর্ঘায়নে স্পর্শ করা যায় না। —সেগুলির ভাব, ভাষা, ছন্দ, বিন্যাস সব কিছুই ভিন্ন প্রকৃতির—যেন কবিতা পড়ার চেয়ে মন্ত্রোচ্চারণের অনুভূতি। এই পর্য্যায়ে প্রান্তিক, সেঁজুতি, আকাশপ্রদীপ, সানাই, নবজাতক, জন্মদিনে, রোগশয্যায়, আরোগ্য ও শেষ লেখাকে স্থান দেওয়া গেল।

ঈশ্বর চেতনা রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত থাকলেও সেই অর্থে ঈশ্বর উপলব্ধি বা **realisation** যা শ্রীঅরবিন্দের জীবনে ঘটেছিল এবং যে উপলব্ধির স্বচনা বাল্যেই দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ঠিক তেমনটি ঘটে নি। লক্ষ্য এক বলে মেনে নিলেও তাঁদের পথ ছিল ভিন্ন। যোগ সাধনা রবীন্দ্রনাথের পথ না হলেও (ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার...), ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় লোকের হাতছানি কবি অনুভব করেছেন, সন্ধান করেছেন, কখনও বা দেখাও পেয়েছেন (মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না); কিন্তু সেই অতিমানস লোকে সর্বদা অধিষ্ঠান তাঁর হয়নি শ্রীঅরবিন্দের যা আয়ত্ত ছিল দীর্ঘ একান্ত নিভৃত যোগ সাধনার ফলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে বলছেন—"শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিমগ্ন আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে দূরেই স্থান দিতে হবে। সব সৃষ্টিকর্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেখানেই যেখানে জমেছে সকলের সঙ্গ—তাঁর উগলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে।" তথাপি দীর্ঘ কাল যে কবির ইহ মানব জীবনের মাধুর্ব আর জগতের সৌন্দর্যই ছিল প্রিয়তর চারণ ভূমি,—শেষ প্রহরে সেই কবিরই পার্থিব সকল বিষয়ের প্রতি মোহক্ষয় এবং অতিমানস লোকের প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর

হয়ে উঠেছিল। যে কবি চিরদিন ব্যক্ত করেছেন নিজের বাসনা—"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই", যে কবির আর্তি "যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় তবু মনে রেখ"—তিনিই শেষ প্রহরে গাইছেন "পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে জীবন ভোজের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।" লিখছেন "ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী আছ তুমি জাগি ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি···বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে।"

১৯৩৭ এর ১০ই সেপ্টেম্বর (২৫শে ভাদ্র) অকস্মাৎ চেতনা হারিয়ে দুদিন পরে আবার চেতন লোকে ফিরে এসে কবি এই প্রত্যাবর্তনকে নব জীবন লাভের সঙ্গে তুলনা করছেন। অন্ততঃ নবচিন্তা ধারার প্রকাশ এর পর থেকে তাঁর কবিতায় দেখতে পাওয়া যেতে থাকল—যার সুরু প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থ থেকে। "মনে ভাবি পুরোনর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি, নূতন বাহিরি এল···।" এই-আপাত বহিঃ চেতনাহীন অবসরে যেন অতিমানসলোকে প্রবেশের রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচিত হয়ে একদিনের অজানা জগতের উজ্জ্বল আভাস পাওয়া গেল। "দেখিনি অদৃশ্য আলো আঁধারের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে, যে আলোক নিখিল জ্যোতির জ্যোতি। দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া আমার আপন ছায়া। সেই আলোকের সামগান মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে সৃষ্টির সীমান্ত জ্যোতির্লোকে, তারি লাগি ছিল মোর আমন্ত্রণ।" ···"অসজ্জিত আদি কৌলিন্যের শান্ত পরিচয় বহি যেতে হবে নীরবের ভাষাহীন সঙ্গীত মন্দিরে একাকীর একতারা হাতে।" ···"অবশেষে দ্বন্দ্ব গেল ঘুচি। পুরাতন সম্মোহের স্থূল কারাপ্রাচীর বেষ্টন, মুহূর্তেই মিলাইল কুহেলিকা। নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত স্বচ্ছ শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে ···বন্ধমুক্ত আপনারে লভিলাম সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে অলোক আলোক তীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে।"

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যে বারবার অস্বচ্ছ দৃষ্টির আবরণ ঘুচিয়ে হে স্বপ্রকাশ তুমি প্রকাশিত হও—আবিরাবীর্ম এধি—এই প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে। "হে পূষণ সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ, দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক···।" এই কবিতা রচনার আট মাস পরে ১৩৪৫ এর নববর্ষ ভাষণে কবি অচৈতন্য অবস্থায় তাঁর বিস্ময়কর অনুভূতির প্রসঙ্গে বলছেন—"কিছু কাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। জীবনে অনেক কর্ম করেছি; এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে, তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে। আমাদের যে শক্তি ···গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সম্ভব হবে···।" জনসমাবেশ ত্যাগ করে রূপরস বর্ণ গন্ধময় পৃথিবীকে সম্ভোগেচ্ছা ত্যাগ করে একাকী একতারা হাতে সুদূর অন্তরাকাশে বন্ধমুক্ত আপনাকে লাভ করার এই প্রয়াসে রবীন্দ্র কি অরবিন্দাভিমুখী হতে চলেছেন? দুজনের যাত্রা ছিলই **towards the same goal**—এবার কি দুটি পথই সমান্তরাল হতে চলেছে?

শ্রীমদ্-ভাগবতসার

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী (প্রয়াত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৯/২৪, বিদর্ভ, চন্দ্রবংশ

শুকদেব বললেন,—বিদর্ভ ও ভোজ্যার দুই পুত্র হয়—কুশ, ক্রথ। তাঁদের তৃতীয় পুত্র কুলনন্দন রোমপাদ। রোমপাদের বংশে ক্রমান্বয়ে বভ্রু, কৃতি, উশিক, চেদি, কুন্তি, বৃষ্ণি, নির্বৃতি, দশার্হ, ব্যোম, জীমূর্ত, বিকৃতি, ভীমরথ, নবরথ, দশরথ, শকুনি, করম্ভি, দেবরাত, দেবক্ষত্র, মধু, কুরুবশ, অন্ধক, সত্রাজিৎ, যুযুধান, অক্রূর, চিত্ররথ, বিলোমা, কপোতরোমা, অণু, দুন্দুভি, অবিদ্য, পুনর্বসু জন্মান। পুনর্বসুর পুত্র আহুক এবং কন্যা আহুকী। আহুকের দুইপুত্র—দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের চারটি পুত্র, দেববান, উপদেব, সুদেব, দেববর্ধন। এঁদের সাতটি বোন ছিল—ধৃতদেবী, শান্তিদেবী, উপদেবী, শ্রীদেবী, দেবরক্ষিতা, সহদেবী ও দেবকী। এই সাত কন্যাকেই বসুদেব বিবাহ করেন। উগ্রসেনের ছিল নয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা। কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ঋষ্টি ও তুষ্টিমান এবং কংসা, কংসাবতী, কঙ্কা, শূরভূ, রাষ্ট্রপালিমা। এই পাঁচ কন্যার বিয়ে হয়েছিল বসুদেবের ছোট ভাইদের সঙ্গে।

অন্ধকের দ্বিতীয় পুত্র ভজমানের বংশে শূর জন্মগ্রহণ করেন। শূরের ছিল দশ ছেলে—বসুদেব, দেবগ, দেবশ্রবস, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, সমীক, বৎসক, বৃক। বসুদেবের জন্মকালে দেব-দুন্দুভি বেজেছিল। বসুদেবের পাঁচ বোন ছিল—পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা, রাজাধিদেবী। শূর তাঁর বন্ধু কুন্তিরাজকে অপুত্রক দেখে নিজের কন্যা পৃথাকে দান করেন। পৃথা দুর্বাসাকে পরিচর্যা করে 'দেবহুতি' বিদ্যা লাভ করেন। এই বিদ্যার শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য তিনি একদিন সূর্যদেবকে আহ্বান করেন। সূর্যদেব বলে পৃথা বিপদ মনে করে তাঁকে বললেন, আপনি চলে যান, আমি কেবল পরীক্ষা করবার জন্য ডেকেছিলাম। সূর্য বললেন,—দেবদর্শন ব্যর্থ হয় না। আমি তোমার গর্ভধান করেও যাতে তোমার যোনি নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করে দেব।

এই বলে সূর্যদেব চলে গেলেন। তখনই পৃথার একটি উজ্জ্বল পুত্র জন্ম নিল। পৃথা লোকভয়ে সেই পুত্রকে নদীজলে পরিত্যাগ করেন। পরে তোমার প্রপিতামহ পাণ্ডু পৃথাকে বিয়ে করেন। পৃথার বোন শ্রুতদেবাকে বিয়ে করেন করূষ রাজ বৃদ্ধশর্মা। তাঁর গর্ভে সন্তবক্রের জন্ম হয়। কেকয়রাজ ধৃষ্টকেতু বিয়ে করেন শ্রুতকীর্তিকে। তাঁর সপ্তর্দনাদি পাঁচটি ছেলে হয়। রাজা জয়সেন বিয়ে করেন রাজাধিদেবীকে। তাঁদের পুত্র বিন্দ ও অনুবিন্দ। চোর্দিরাজ দম শ্রুত শ্রবার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁদের পুত্র শিশুপাল।

দেবভাগের স্ত্রী কংসা, তাঁদের দুই পুত্র—চিত্রকেতু, বৃহদ্বল। দেবশ্রবমের স্ত্রী কংসবতী, তাঁদের পুত্র—সুধীর, ইক্ষুমান। কঙ্ক ও কঙ্কত্রয় সন্তান বক, সত্যজিৎ, পুরুজিৎ। সৃঞ্জয় ও রাষ্ট্রপালীর পুত্র রাম; দুর্মর্ষণাদি। শ্যামক ও শূরভূমর পুত্র হৃষিকেশ ও হিরণ্যাক্ষ। বৎসক ও মিত্রকেশী

অপ্সরার পুত্র বৃক ইত্যাদি। বৃক ও দূর্বাক্ষীর পুত্র তক্ষঃ, পুষ্কর, মাল্য ইত্যাদি। শমীকে ও সুদামনীর পুত্র সুমিত্র, অর্জুনপাল ইত্যাদি। অশোক ও কর্ণিকার পুত্র জয় ও ঋতধামা।

বসুদেবের পৌরবী, রোহিনী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা ও দেবকী প্রমুখ পত্নীগণ ছিলেন। বসুদেব রোহিনীর গর্ভে বলভদ্র, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল, ধ্রুব ও কৃতাদি পুত্রগণ উৎপাদন করেন। কৌরবীর গর্ভে সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ ও ভদ্র প্রভৃতি বারটি পুত্র জন্মে। মন্দিরার গর্ভে নন্দ, উপনন্দ, কৃতক, শূর প্রভৃতি জন্মান। কৌশ্যার একটি পুত্র—নাম কেশি। রোচনার গর্ভে হস্ত, হে মাঙ্গদ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মে। ইলার গর্ভে জন্মেন উরু, বল্কল প্রভৃতি। ধৃতদেবীর গর্ভে জন্মান বিগৃষ্ঠি, শান্তি দেবীতে প্রশম, প্রহিত প্রভৃতি। উপদেবার গর্ভে রাজন্য, কল্প, বর্ষ প্রভৃতি দশটি মণ্ডল হয়। শ্রীদেবার বসু, দুঃখ, সুবংশ প্রভৃতি ছয়টি পুত্র হয়। দেবরক্ষিনগর গদ প্রভৃতি নয়টি পুত্র হয়। সহদেবের আটটি পুত্র হয়—প্রবর, শ্রুতমুখ্য ইত্যাদি। বসুদেব দেবকীতেও অষ্টপুত্র উৎপাদন করেন, যথা—কীর্তিমান, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দন, ভদ্র, অহীশ্বর, সংকর্ষণ। বসুদেব ও দেবকীর অষ্টম পুত্র হয়েছিলেন স্বয়ং হরি। তোমার পিতামহী সুভদ্রাও তাঁর কন্যা। ধর্ম কমে গিয়ে অধর্ম বাড়লেই হরি নিজেকে সৃজন করেন। মায়া - নিয়ন্তা, সঙ্গ - বিহীন, সর্বসাক্ষী এবং সর্বগত ভগবান মায়াবিনোদের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। বহু রাজচিহ্নধারী অসুরদ্বারা পৃথিবী ভারাক্রান্ত হলে তার ভার কমাবার জন্য ভগবান উদ্যোগী হন্। সমস্ত মানব ভগবানের চরিত্রের শ্লাঘা করে থাকেন। ভগবান স্নিগ্ধ - সস্মিদর্শন, উদারবাক্য, বিক্রমলীলা, সমস্ত অবয়ব ও রম্যমূর্তি দ্বারা সমস্ত মনুষ্যলোককে আনন্দিত করেছিলেন।

যস্যাননং মকরকুন্তলচারুকর্ণপ্রাজং কপোলসুভগং
সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো
নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ॥

মকর - কুন্তল দ্বারা, মনোহর কর্ণ এবং উজ্জ্বল কপোল দ্বারা সুন্দর অতএব নিত্যোৎসব ময়, যাঁর বদন নয়ন দ্বারা পান করে আনন্দিত নয় ও নারীগণ তৃপ্ত হন্ নাই, বরং নিমেষ থাকায় দর্শনের ব্যাঘাত হওয়ায় নিমেষকর্তা নিমির প্রতি রাগ করতেন।

হে রাজন্, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করবার পরই পিতৃগৃহ থেকে ব্রজে চলে যান, সেখানে শত্রুদের বধ করে ব্রজবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করেন, পরে অনেক বিয়ে করে স্ত্রীগণের শত শত পুত্র উৎপাদন করে ও লোকসমাজে নিজের বেদ - পথ প্রচার করে বহু যজ্ঞ দ্বারা তিনি নিজেরই অর্চনা করেছিলেন। ভগবান কুরুগণের পরস্পরের মধ্যে কলহ দ্বারা পৃথিবীর গুরুতর ভার নষ্ট করে এবং যুদ্ধস্থলে উপস্থিত সৈন্যগণকে দৃষ্টিমাত্র ধ্বংস করে অর্জ্জুনের জয় ঘোষণা করে এবং উদ্ধবের নিকট পরমতত্ত্ব উপদেশ করে নিজধামে চলে গেছেন।

(ক্রমশঃ)

এই যে ধুলা আমার না এ

মনোতোষ দাশগুপ্ত, জ্ঞানব্রত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রওনা হলাম। বেলা দুটোয়। একটু এগিয়ে পেলাম ঢাকার সুন্দর ফ্লাইওভার-টি। ডানদিকে যাওয়া যাবে না বলে ফ্লাইওভার ধরে মালিবাগের দিকে গিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়ে সারদাবাগের অতীশ দীপঙ্কর মহাসড়ক (মাওদা বাজার) ধরে চললাম। অল্প একটু পরে নারায়ণগঞ্জ পেলাম। নারায়ণগঞ্জ আমার জন্মভূমি। অদ্ভুত একটা স্মৃতিমেদুর আচ্ছন্নতায় ডুবে গেলাম। পার হলাম শীতলক্ষা নদী ও তারপর তার একটি শাখা। পেরিয়ে গেলাম বিরাট মেঘনা নদী এবং অবশেষে গোমতী নদী পেরিয়ে কুমিল্লার দাউদকান্দিতে এসে পড়লাম বেলা তিনটে নাগাদ। কুমিল্লা বেশ বড় জেলা। কুমিল্লা শহরটি একটি ক্যান্টনমেন্ট। বিরাট ও সুন্দর স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মারক পার্ক আছে, আছে মুক্তি যুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য। সাড়ে চারটায় কুমিল্লার সুন্দর তাজমহল হোটেল-রেস্তরাঁয় বাস থামল। খুব সুন্দর চা ও ফ্রুট কেক্ খেলাম। তারপর ফেণী হয়ে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঢুকলাম চট্টগ্রাম জেলায়। জায়গাটার নাম 'বারইর পাড়া।' বড় বড় সব বাজার ছাড়িয়ে যেতে লাগলাম। খুবই আরামে ও নিশ্চিন্ত আমরা যাচ্ছিলাম। বাসের কর্মীরা খুবই ভদ্র ও সাহায্যপরায়ণ। এই বাসগুলোতে টেলিভিশন থাকে, তাতে সিডি-তে স্থানীয় নাটক দেখানো হয়। আর দূরক্ষেপে শোনানো হয় গান। পুরানো দিনের বিখ্যাত সব গান—হেমন্ত, সন্ধ্যা, মানবেন্দ্র প্রমুখের —বাজানো হচ্ছিল। সহযাত্রিণীরা সমবেত কণ্ঠে গান গাইলেন কিছুক্ষণ। আমাদের সঙ্গে তাঁর সি-ডি দিয়েছিলেন শ্রীমতী মেখলা দাশগুপ্ত ধলঘাট ও গুজরায় দেবার জন্য। ওই সি-ডিটা আমরা বাসকর্মীকে দিলাম বাজাবার জন্য। সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীতগুলো আমেজ নিয়ে শুনতে শুনতে আমাদের চট্টগ্রাম যাত্রা। মোট পনেরোটি গান—এর মধ্যে পাঁচটি প্রেম পর্যায়ের, দুটি প্রকৃতি পর্যায়ের আর বাকী আটটি 'পূজা' এবং 'পূজা এবং প্রার্থনা' অভিধার। তবে রবীন্দ্রনাথের সব পর্যায়ের গানকেই পূজা পর্যায়ে ফেলা যায়—'স্বদেশ' পর্যায়ের গান তো দেশমাতৃকার পূজা-ই। এই যে মেখলা গেয়েছেন: "এখনো তারে চোখে দেখিনি / শুধু বাঁশি শুনেছি / মন প্রাণ যাহা ছিল / দিয়ে ফেলেছি" —এ তো প্রেমের গান। কিন্তু ধলঘাট ও গুজরার প্রতি এখন আমাদের যে মনোভাব, তা কি এই গানের মধ্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়নি? ভালো লাগছিল, ভা—রী ভালো লাগছিল। এসে গেলাম চট্টগ্রামের বিখ্যাত তীর্থস্থান সীতাকুণ্ড ও বাড়বকুণ্ড। বাঁদিকে সেখানে যাবার পথের নির্দেশিকা দেখলাম বোর্ডে। অবশেষে রাত ৮ টায় চট্টগ্রামের কর্ণেল হাটে বাস থামল। রাত হয়ে গেছে, তাই বাস কোম্পানীর ছোট বাসে করে আমাদের ডামপাড়া টার্মিনাসে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন শ্রীমিহির কানুনগো, রাজীব দত্ত প্রমুখ সুজনেরা। শ্রীকানুনগো বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি চলতি বাসে বাস কর্মীর মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে আমাদের নিশ্চিন্ত করেছিলেন। গাড়ির

ব্যবস্থা ছিল। বাস থেকে মালপত্র নামিয়েছিল একটি বাচ্চা ছেলে—কর্ণেলহাট ও ডামপাড়া দু জায়গাতেই; আবার দু জায়গাতেই বাসে তুললও ছেলেটি। পারিশ্রমিক চায় ক'টি টাকা। আহারে! শিশু শ্রম নাকি নিষিদ্ধ করতে ব্রতী জাতিসংঘের মাধ্যমে আজকের বিবেকবান মানুষ? আগে তবে দারিদ্র্য আর অভাব দূর করতে হবে।

রোমাঞ্চিত হয়ে ভাবছিলাম, এলেম তাহলে চট্টগ্রামের মাটিতে। এ মাটির গর্ব ও গৌরব, অখানে আবির্ভাব ঘটেছিল পরমারাধ্য সাধুবাবার ও পরমারাধ্যা সাধুমার; এ মাটি ধরে রেখেছে সূর্য সেনের তেজ। কানুনগো মশায়ের সঙ্গে চললাম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেল অভিমুখে। সুন্দর চকচকে মসৃণ রাস্তা—নাম এশিয়ান হাইওয়ে; রাস্তাটা ইরাণ থেকে চট্টগ্রাম হয়ে ব্রহ্মদেশ (মায়নমার) পর্যন্ত বিস্তৃত। যেতে বাঁ দিকে আলো দিয়ে সাজানো একটা ক্লাববাড়ি পড়ল। বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিন্তু এর ঐতিহ্য অন্যত্র। সূর্য সেনের শহর এই চট্টগ্রামে ব্রিটিশ রাজত্বের সময় এটি ছিল ইউরোপীয়ান ক্লাব। এখানেই অভিযান চালিয়েছিলেন সূর্য সেনের অনুমতি নিয়ে। তাঁর একান্ত স্নেহের পাত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। সে এক গৌরবময় ঘটনা যার বিবরণ শুনে সেদিনের ভারতবর্ষ অবাক বিস্ময়ে বলে উঠেছিল: ধন্য তুমি চট্টগ্রাম। ১৯৩০ এর ১৮ই এপ্রিল মাষ্টারদার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের প্রধান সরকারী অফিস ও অস্ত্র গারের অধিকার নিয়ে নেয়। উচ্চস্তরের ব্রিটিশ আধিকারিকরা ভয়ে সমুদ্রে নোঙর করা জাহাজে পালিয়ে যায়। চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করে বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে ২২শে এপ্রিল কয়েকশ' ব্রিটিশ ও গোর্খা সৈন্য বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। পঞ্চাশ - ষাট জন বিপ্লবীর সঙ্গে ওই সৈন্যদের যুদ্ধ বাঁধে। এর নাম জালালাবাদের যুদ্ধ। এতে একশ সৈন্য ও বারোজন বিপ্লবী মারা যান। অন্ধকার হলে বিপ্লবীরা আবার আত্মগোপন করেন। এই যে ঘটনা—তা এমনই উন্মাদনা জাগাল চট্টগ্রামের যুবকদের মনে যে তা মশালের মত ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে। ইংরেজদেরও তাহলে হারানো যায়। এর বছরখানেক পড়ে প্রীতিলতা মাষ্টারদার অনুমতি চাইলেন পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবে অভিযান চালাবেন। মেয়ে ও অল্পবয়স্ক বলে মাষ্টারদা প্রথমে মত দেন নি। প্রীতিলতা বলেন, 'স্বাধীনতার যুদ্ধে কি শুধু ছেলেদেরই অধিকার?' তাঁর আগ্রহ দেখে তিনি মত দেন। ১৯৩২-এর ২৪ সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা সাতজন সঙ্গী নিয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। পরে গ্রেপ্তার এড়াতে প্রীতিলতা শহীদের মৃত্যুবরণ করেন আত্মহত্যা করে। মনে মনে শ্রদ্ধা জানালাম এই বীর নারীকে। আর স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলাম চট্টগ্রাম অস্ত্রাগারের স্থানটির কথা, ওখানে গিয়ে কিছু দেখা যায় কিনা। শ্রীকানুনগো বললেন, "ওখানে এখন আর কিছু নেই, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ হয়েছে।"

"কোন চিহ্ন নেই?"

"হয়ত একটা প্লাক বা ট্যাবলেট আছে, তবে ও না থাকার মতোই।"

জিজ্ঞেস করলাম মিহিরবাবুকে, "মিহিরবাবু একটা কথা জিজ্ঞেস না করে পারছি না, বড় কৌতুহল হচ্ছে; হেমচন্দ্র কানুনগো, মোতি কানুনগো—এঁরা আপনাদের কেউ?"

হেমচন্দ্র কানুনগো (দাস) ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী। মুরারীপুকুর মামলায় তাঁর নাম জড়িয়েছিল। একবার একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ বিপ্লবীদের আস্তানা রেইড করে। আবাসিকরা অবশ্য খবর পেয়ে পালিয়ে যান। কিছু পরে খেয়াল হয় যে আস্তানায় অনেক দরকারি ও গোপন কাগজপত্র রয়ে গেছে। হেমচন্দ্র সেগুলি উদ্ধারের ভার নিলেন। এদিকে পুলিশ তো ওই আস্তানার কাছে গিয়ে ঘিরে ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, ঢুকতে সাহস পাচ্ছে না, যদি ভিতর থেকে গুলি গোলা বা বোমা ছোঁড়া হয়! এমন সময় একটি কাবুলিওয়ালা এসে হাজির গালাগাল দিতে দিতে। এখানকার একজন নাকি তার কাছ থেকে টাকা ধার করেছে, কিন্তু শোধ দিচ্ছে না। আজ সে এসেছে, টাকা না নিয়ে যাবে না। পুলিশেরা ভাবলো, যা শত্রু পরে পরে। ওকেই এগিয়ে দিল; বলল' দেখে এসে খবর দিতে। কাবুলিওয়ালা গালাগাল দিতে দিতে ঢুকে গেল, আবার গালাগাল দিতে দিতে বেরিয়েও এল, কেউ নাকি নেই ভিতরে। ওই কাবুলিওয়ালাই ছিলেন হেমচন্দ্র—গোপন কাগজপত্র তখন তার জোব্বার পকেটে। বললাম গল্পটা মিহির বাবুকে। আর মোতি কানুনগো ছিলেন জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধের বীর সেনানী। ১৯৩০ এর ২২শে এপ্রিল যখন ব্রিটিশ সৈন্য জালালাবাদ পাহাড় চারদিক থেকে ঘিরে ধরে, তখন পুরোদিনের যুদ্ধে যে সব বিপ্লবী মারা যান তাঁরা হলেন প্রভাস পাল, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, জিতেন দাশগুপ্ত, মধু দত্ত, পুলিন ঘোষ, নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরি গোপাল বল (টেগ্‌রা, লোকনাথ বলের ছোট ভাই) এবং ওই মোতি কানুনগো। মিহির বাবু বললেন "ডাইরেক্ট সম্পর্ক জানি না, তবে জ্ঞাতি তো নিশ্চয়ই।"

পৌঁছুলাম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেলে। সদরঘাট অঞ্চলের শাজাহান হোটেল। হোটেলটি বেশ ভালো। নমিতাদি ও ওঁর ছোট বোন মিতা, শুনলাম, এসে গিয়েছেন। নৃপেনদা (তারামঠের সম্পাদক প্রয়াত ডাঃ নৃপেন্দ্র নাথ মুখার্জি)-র দুই মেয়ে এঁরা, প্লেনে সরাসরি চট্টগ্রাম এসেছেন কলকাতা থেকে। হোটেলে পৌঁছে দেখলাম আরও সব সুজনেরা আমাদের প্রতীক্ষায় আছেন। আমাদের সঙ্গেই বাস টার্মিনাস থেকে এসেছিলেন শ্রীবিবেকানন্দ চৌধুরি। তিনিই মালপত্র সব নামাবার ব্যবস্থা করলেন। ঘরগুলি দেখে নিলাম। মোট ছটি ঘর —আমরা ১৩ জন হওয়ায় দোতলায় এ-সি ঘরে তিনজনের ব্যবস্থা হয়েছে অতিরিক্ত একটা শয্যা দিয়ে। বাকী পাঁচটা ঘর তিনতলায়। এ-সি ঘরটিতে গরম জলের ব্যবস্থা আছে, সবাই সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। নমিতাদি-রা দোতলায় আর একটি এ-সি ঘরে রয়েছেন। প্রয়োজনীয় সই-সাবুদ করে অনেকে পরিচ্ছন্ন হতে গেলেন, অনেকে আবার হাত মুখ ধুয়ে এসে বসলেন। সবার সঙ্গে আলাপ হল। ধলঘাট সিদ্ধাশ্রমের শ্রীদিলীপ ভট্টাচার্য্য গুজরার আশ্রমের শ্রীধ্রুবব্রত চক্রবর্তী ছিলেন। 'আজাদী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও সাহিত্য-সাময়িকীর সম্পাদক বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক অরুণ দাশগুপ্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আসতে পারেন নি। 'ক্রণন্' নামের চট্টগ্রামের একটি বিখ্যাত ভাষা সংস্কৃতি সংস্থা সেদিন তাঁকে জীবন ব্যাপী সাধনার জন্য পুরস্কৃত ও সম্বর্ধিত করলেন। তিনি বলেছেন, অবশ্যই পরদিন আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। ইনি আবার

আমাদের পাঁচিদির ভাইপো। সবাই মিলে আমাদের পরের তিনদিনের ভ্রমণ ও কর্মসূচী ঠিক করা হল। ইতিমধ্যে খাবারের কথা বলা হয়েছিল। খবর এল দোতলার ডাইনিং হলে খাবার দেবে। বললে ঘরে ঘরে দিত, তবে আমরা একসঙ্গে বসেই খাওয়া পছন্দ করলাম; বিশেষ করে মম্ ও শ্রাবন্তীতো বটেই। আসার আগে একবার কথা হয়েছিল যে আমরা দুদলে ভাগ হয়ে দু' জায়গায় থাকব, তাতে ওদের সে কী অনীহা। আরও তিনদিন থাকব, দেখা হবে; তবু যেন কথা আর শেষ হয়না মিহিরবাবুদের। কে বলবে একটু আগে সবে ওঁদের দেখলাম আমরা। যেন কতদিনের চেনা! সত্যি অসাধারণ ওঁদের ব্যবহার, ভদ্রতা ও আতিথেয়তা। আমরা তো অভিভূত। খেতে গেলাম; পদ—রুটি/ভাত, ডাল, সব্জি—একেবারে গরম গরম। বেশ খেলাম। ঠাণ্ডা আছে। একটা চাদর জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

আমাদের এই 'শাজাহান হোটেল' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'এশিয়াটিক কটন মিল্স্'-এর মালিক আবু হজ্জ আব্দুল মাবুদ সওদাগর। হোটেলটির ঠিক সামনের রাস্তার উল্টোদিকে একটা সিনেমা হল, 'লায়ন সিনেমা'। এখানেই ১৯৩৫-৩৬-এ রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পর্ষৎ-এর চট্টগ্রাম শাখা উদ্বোধন করতে। তখন অবশ্য এই হলটা ছিল না। এক জমিদারের সম্পত্তি ছিল ওটা; একটা বড় সভাগৃহ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম এসে দুদিন থেকে, তারপর কর্ণফুলি নদী ধরে ষ্টীমারে বরিশালে যান তখন তো চট্টগ্রাম আরও বড়। এখন চট্টগ্রাম জেলাটি দুভাগ হয়েছে। এর তিনটি উপজেলা—বন্দরবন, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি (সুবল মিত্রের অভিধানে বলা আছে 'রঙ্গমতী') নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে মহকুমাকে উপজেলা বলা হয়। এটা কিন্তু ভাষাগত ভাবে সঠিক, কেননা আমরা মহকুমার ইংরেজী করেছি 'সাব্ডিভিসন'। সেক্ষেত্রে জনপদের প্রশাসনিক বিভাজন হয় বিভাগ বা ডিভিসন, জেলা বা ডিস্ট্রিক্ট আর মহকুমা বা সাব্ডিভিসন। সাব্ডিভিসন তো বিভাগের উপ-একক; কিন্তু তা জেলার হয় কী করে? তাই বাংলাদেশে ক্রম হচ্ছে—বিভাগ—জেলা—উপজেলা।

(ক্রমশঃ)

মহাভারতের শাশ্বত কথা

শ্রীদেবব্রত দাশ (সাহিত্য শেখর)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

সনাতন ধর্মে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথার সামাজিক তাৎপর্য থাকলেও এর কোন ধর্মীয় তাৎপর্য নেই। এই ধর্মের মূল তত্ত্বে বলা হয়েছে প্রাণী মাত্রেই—'ব্রহ্মজ'। ব্রহ্ম সর্বব্যাপী। দেহ নয় আত্মাই প্রধান। দেহের বিনাশ আছে, আত্মা অবিনাশী। আত্মা এবং পরমাত্মা বা ব্রহ্ম অভিন্ন।

বর্ণ বিভাগ চার ধরনের যা মূলত কর্ম নিরিখে বিন্যস্ত। এই চারটি বর্ণ বা জাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কর্মের তাৎপর্য অনুসারে মানুষের বর্ণ চিহ্নিত হবার পরিচয়ও আমরা দেখেছি। বংশানুক্রমিক জাতিবিন্যাস প্রাচীনকালেও স্বীকৃত ছিল না। মহারাজ যুধিষ্ঠির বনপর্বে পরিষ্কার বলেছেন ব্রাহ্মণত্বের বিচার মানুষের আচরণ অর্থাৎ চারিত্রিক গুণাবলী, যেমন সত্য, ক্ষমা, দান, সদ্গুণ ইত্যাদির দ্বারাই বিচার্য। তিনি আরো বলেছেন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই তাকে যেমন ব্রাহ্মণ বলা যাবে না আবার অন্যপক্ষে পিতামাতা শূদ্র হলেই কাউকে শূদ্র বলে চিহ্নিত করা যাবে না। আরো আগে ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা দেখি, জবালা পুত্র সত্যকামের স্পষ্ট, অকপট সত্য ভাষণ শুনে মহর্ষি গৌতম তাকে ব্রাহ্মণত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। প্রাচীন ভবিষ্যপুরাণ বলেছে, সব মানুষই ঈশ্বরের সন্তান, তাই তারা এক বর্ণের। সমস্ত মানুষের জনক এক, আর একই জনকের সন্তানদের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বা জাত হতে পারে না।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন মহর্ষি ভরদ্বাজ। তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, মানুষ মাত্রেই কাম, ক্রোধ, ভয়, দুঃখ, উৎকণ্ঠা, ক্ষুধা আর শ্রম এই সবেই কম বেশি প্রভাবিত হয়ে থাকে, তা হলে জাতিগত তফাৎ কোথায়? এই প্রশ্নের সূত্র ধরেই আমরা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব। মহাভারতের শান্তিপর্বে অন্তর্ভুক্ত ভৃগু-ভরদ্বাজ সংবাদ। এই সংবাদে আত্মার অস্তিত্ব, পুর্ণজন্ম প্রভৃতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে; আছে নৈয়িক অর্থাৎ অর্কিক যুক্তি-প্রতিযুক্তির মীমাংসা। বর্তমান আলোচনা আমরা কেবলমাত্র জাতিভেদ বা বর্ণভেদ অংশটুকুতেই সীমাবদ্ধ রাখব। গত সংখ্যায় উল্লেখ করেছি, আবারো বলছি, এই সংবাদ আমাদের প্রাচীন ন্যায়দর্শনের এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

মহর্ষি ভৃগুর আলোচনার সূত্র ধরে আমরা জানতে পারি যে, এই সংসারে দেব, দানব, গন্ধর্ব, দৈত্য, সর্প, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, বিভিন্ন প্রকার পশু উদ্ভিদ, বৃক্ষবর্গ, তৃণ, কীটপতঙ্গ হতে মানুষ সবই অর্থাৎ ব্রহ্মা হতে জাত। ব্রহ্মাণ্ড মানসপুত্র ছয় বিখ্যাত ঋষি-প্রজাপতিরই অধঃস্তন সবাই। সমস্ত প্রাণের উৎস যেমন ব্রহ্মা বা আদি প্রজাপতি, তিনি আবার এই সৃষ্টির রক্ষণ বর্ধন এবং শ্রী এই ত্রয়ীর কল্পে সত্য, ধর্ম, তপস্যা, সনাতন জ্ঞান (বেদ), আচার, শৌচ, দম্ভ প্রভৃতিরও প্রবর্ত্তক —বিদধে' প্রভুঃ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে সমগ্র জগৎ চরাচরই ছিল জলময় —অম্ময়ং সর্বমেবেদমাপো মূর্ত্তিঃ শরীরিনাম. প্রাণী সমূহের দেহও প্রধানতঃ জলময়। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিন প্রকৃতি নিয়েই প্রতিটি জীবের উদ্ভব।

সেজন্য ত্রিগুণযুক্ত জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়েছে। যিনি এই ত্রিগুণ-রহিত, সেই চিন্ময় শক্তিই পরমাত্মা। প্রতিটি জীবই পঞ্চভূতের আধার। এই পঞ্চভূত হলো– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ। এই পাঁচটি বিষয়ে জীবের আসক্তি সে কারণেই স্বাভাবিক ভাবেই রয়েছে। আবার জীব দেহটি মাংস, রক্ত, মেদ, স্নায়ু এবং অস্থির সমন্বয়ে গঠিত। মজার কথা হলো, এই দেহের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয়—চোখ, কান, নাক, জিভ, ত্বক যা দিয়ে সে আপন আসক্তি অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শকে অনুভব করে তা কিন্তু ঐ পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়। এদের পেছনে মন বা চৈতন্য নামে এক এমন একটি শক্তি রয়েছে যা এদেরকে সবসময় নিয়ন্ত্রণ করছে। অন্যমনস্ক থাকলে চোখের সামনে ঘটে যাওয়া জিনিস তো আমরা দেখতেই পাই না, শুনতেও পাই না।

তাহলে দেখা গেল পাঁচটি ইন্দ্রিয় ছাড়া জীবের আরো একটি বিশেষ শক্তি রয়েছে সেটি হল 'মন' —যাকে সব ইন্দ্রিয়ের অধিপতি বা নিয়ন্ত্রক বলা হয়। এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ যার মধ্যে সমধিক রয়েছে সেই জীবটিই হলো মানব। মন আছে বলেই সে চিন্তা করতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে। তার জীবন পরিধিকে সে উন্নত করতে পারে। মনের আবার নানান্ স্তর রয়েছে, সেই বিচারে মানুষে মানুষে তফাৎও আছে। বুদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা সবই মনের উন্নত স্তরের বিষয়। এককথায় মানব বা মানুষ মাত্রেই মনোময় জীব।

অতীতে মানুষ বাঁচার তাগিদে যখন বাসা বাঁধল, সমাজ গড়ল, তখন হতেই তারা নানা অনুশাসনে নিজেদের বাঁধল। নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠল নানান্ বিশ্বাস, সংস্কার। ভাল-মন্দ দুই মিলিয়ে শুরু হল পথ চলা। নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রহণ-বর্জন, যুক্তি-বিশ্লেষণ চলল পায়ে পায়ে। বাঁচার তাগিদে মানুষই নিল স্রষ্টার ভূমিকা। কত উদ্ভাবন, নতুন নতুন চিন্তা ঠাঁই পেল এই সরণীতে। ক্রমশ সে হয়ে উঠতে লাগল দক্ষ, কুশল। এই দক্ষতা বা কুশলতা আবর্তিত হলো গোষ্ঠী ঘিরে। গোষ্ঠী হতে পরিবারে যা বিশেষ বিশেষ স্থানে গড়ে উঠল বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে। পরিবারের নির্দিষ্ট মানুষের হাতে তার সূক্ষ্মতা, কুশলতা অপরূপ রূপ পেল। এই দক্ষতাকে ধরে রাখার জন্য তার চর্চা যেমন নিবিড় হল ঐ বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ গোষ্ঠী বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এবং তা সম্প্রদায়গত ভাবে নির্দিষ্ট হয়ে রইল জন্মজন্মান্তরের বিশেষ চর্চায়, অনুশীলনে। সমাজ এই সব পরিবার কিংবা গোষ্ঠীদের ঐ সব বিশেষ গুণের জন্য স্বীকৃতিও দিল। মান্যতা, প্রতিষ্ঠা এবং পরিচয় সবই এল বিশেষ গুণের পারদর্শীতা হিসেবে।

এই বিশেষ গুণাবলী কি? সামাজিক মানুষের বাঁচার জন্য যেমন, তেমনি মননশীল মানুষের বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে, তার উন্নতি, প্রগতি, শ্রীবৃদ্ধি সব কিছুকেই কেন্দ্র করে মানুষ কিছু বিশেষ বিষয়ের চর্চা শুরু করেছিল। যার মধ্যে প্রধান প্রাণরক্ষা, আত্মরক্ষা। তার পর ক্রমান্বয়ে মস্তিষ্কের চর্চা। মননের গভীর অনুশীলন। আদি পর্বের নিয়াণ্ডারথাল মানুষ, সোয়ানকুম মানুষ হতে ক্রোম্যাগনন বা আধুনিক মানুষের ক্রমপর্যায়ে এ ধারা অব্যাহত। প্রজ্ঞার ধারক এবং বাহক বলে যে মানুষের পরিচয় আমরা বহন করে চলেছি অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়েন্স মানুষ, তারাই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল ককেসয়েড, মঙ্গোলয়েড

এবং নিগ্রয়েড এই তিন ভিন্ন জাতির গোষ্ঠী পরিচয়ে।

বর্তমান পৃথিবীতে যত মানুষ জাতি আমরা দেখি সবাই কিন্তু একই বর্গ (Genus) এবং প্রজাতি অর্থাৎ species হতে জাত। মূলত জিনঘটিত পরিব্যক্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচন, জিনের নিষ্ক্রিয়তা, পরিবেশগত প্রভাব এবং জন মিশ্রণের প্রভাবেই মানুষের বহু পরিবর্তন এবং বিভিন্নতা। ক্রমবিকাশের সুশৃঙ্খল সারণি বেয়ে মানুষের যে পথ চলা,—তার বাঁচার মূল মন্ত্রই হয়ে দাঁড়াল 'এগিয়ে চলো'—চরৈবেতি! কারণ চলা বা এগোনোই জীবন আর থামা-ই যে মৃত্যু।

তুষার যুগ হতে পরবর্তী বিভিন্ন যুগে মানুষের ক্রমবিবর্তন এবং ক্রমবিকাশ এক সাদৃশ্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল ধারায় এগিয়েছে। তুষার যুগ তার পরবর্তী-দীর্ঘ-শুষ্ককাল, প্রস্তর যুগের আদি, মধ্য এবং নব প্রস্তর যুগ, যাদের পরিচয় ভারতবর্ষের দক্ষিণে বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। তৎপরবর্তী, তাম্র, ব্রোঞ্জ, লৌহ এবং সোনা—এ যুগে যাকে নব-প্রস্তর যুগ আখ্যা দেওয়া হয়েছে—তাদের নিদর্শন-তো সারা ভারতবর্ষ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে। এ সময়ে মানব সমাজ এবং জীবনচর্যা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এসেছে ধর্ম—যা তৈরি করেছে স্বভাব এবং শৃঙ্খলা। বিবর্তনের ধারায় মানুষ ক্রমে ক্রমে প্রাণময় অন্নসত্তা, জৈবিক সত্তা হতে মনোময় সত্তায় উন্নীত হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অভিজ্ঞতায় সে সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতিকে চিনতে শিখেছে।

প্রকৃতির মধ্য হতে মানুষ শক্তি সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল। সে যেন বুঝল মানুষ মূলত দুধরণের নর এবং নারী। তেমনি, এই প্রকৃতির মধ্যে দুধরণের শক্তি নিয়তই নীরবে কাজ করে চলেছে। বহু বিচিত্র এই বসুধা যেমন সদা পরিবর্তনশীল, তেমনি অনন্ত আকাশ ঘিরে যে বিশ্বচরাচর তাও যেমনি পরিবর্তনশীল, সক্রিয় এবং অনন্ত শক্তিশালী। তার সাথে তাল মিলিয়ে নিজেকে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত না করতে পারলে সে টিঁকতে পারবে না।

একদিকে অনন্ত বিশ্ব-জগতের রহস্য, তার বিপুল শক্তি মানুষের মনে যেমন ভয় সৃষ্টি করল, তেমনি এই ভয় হতে ত্রাণের উপায়ও সে নিত্য অনুসন্ধান করে চলল। একদিকে পূজা, নানান্ বিশ্বাস, লৌকিক আচার, গভীর সংস্কার যেমন গড়ে উঠল, অন্যদিকে নিরন্তর চলল গভীর অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, কার্যকারণ খোঁজার নিবিড় প্রচেষ্টা। এই দুয়ের মাঝখানে মানুষ লাভ করল অপূর্ব সম্পদ। সে মুগ্ধ হল বিশ্ব প্রকৃতির অপরূপতাকে প্রত্যক্ষ করে, তার বৈচিত্র্যকে আস্বাদন করে, তার বিপুল শক্তিকে উপলব্ধি করে। ভয় এখানে মুছে গেল ধীরে ধীরে, কারণ মানুষ বিশ্বচরাচরের অনন্ত রহস্যের ঘন আবরণ যে একটু একটু করে উন্মোচন করে তাকে চিনতে, জানতে এবং ক্রমেই ভালবাসতে শিখেছে। জন্ম নিল শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং কর্তব্যবোধ। সংকটকালে যা ছিল শুধুই ভয়ের তা ক্রমশই পর্যবসিত হলো বিস্ময়ে, ভক্তিতে, সম্ভ্রমে। নিখিল বিশ্ব তার কাছে ধরা দিল মহিমময় রূপে, পরমাত্মার স্বরূপে—পূজিত এবং প্রণম্য হলো বিশ্বাত্মার স্বরূপে। একে একে গড়ে উঠল বহু সভ্যতা।

ভারতবর্ষের সব চাইতে প্রাচীন সভ্যতা—সিন্ধু সভ্যতা! আর্য সভ্যতা অনেক পরে। এই সিন্ধু সভ্যতা একটি বিষয়ে, অর্থাৎ বৈষয়িক বিষয়ে পরবর্তী আর্য সভ্যতার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত ছিল।

সাধারণ ধারণা, দাস, দস্যু, পণি, অসুর, কিরাত, নাগ এবং নিষাদ সভ্যতা—অসভ্য বর্বর, বৈদিক সাহিত্যে আমরা অনেকটা সেরকমই পরিচয় পাই, কিন্তু, শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯২২-২৩) যুগান্তকারী আবিষ্কার—সিন্ধু সভ্যতা (মহেন-জো-দারো এবং হরপ্পা) বহু দিনের সেই ধারণাকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিয়েছে।

(ক্রমশঃ)

উপনিষদ কী ও কেন

শ্রীসুনীল রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন উপনিষদ

৫ম শ্লোক—আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়ির্বা চন্দ্রমাঃ ; রয়ির্বা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং চামূর্তং চ, তস্মান্ মূর্তিরেব রয়িঃ ॥৫

সরলার্থ—আদিত্যেই (সূর্য) প্রাণ, রয়িই চন্দ্র। মূর্ত এবং অমূর্ত সমস্তই রয়ি। অমূর্ত হতে পৃথক যে মূর্তরূপে সেই মূর্তিই রয়ি।

এখানে আদিত্যকে যে প্রাণ ও ভোক্তা বলা হয়েছে তার কারণ আদিত্যই প্রাণের উৎস। সূর্যোদয় হলে বিশ্বের সব কিছু প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আবার সূর্য অস্তমিত হলে সমস্ত প্রাণী নিদ্রিত হয়।

চন্দ্রকে রয়ি এবং ভোগ্য বলা হয়েছে তার কারণ চন্দ্র দ্বারা শস্যাদি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তাহা জীবের খাদ্য, জীব সেই খাদ্য দ্বারা প্রাণ ধারণ করে থাকে।

৬ষ্ঠ শ্লোক—অথাদিত্য উদয়ন্ যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি, তেন প্রাচ্যান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে। যদ্ দক্ষিণাং, যৎ প্রতীচীং, যদুদীচীং, যদধো, যদূর্ধ্বং, যদন্তরা দিশো যৎ সর্বং প্রকাশয়তি, তেন সর্বান্ প্রাণান্ রশ্মিষু সন্নিধত্তে ॥৬

সরলার্থ—সূর্য উদিত হয়ে যে পূর্বদিকে প্রবেশ করেন তার ফলে পূর্বদিকস্থ সমস্ত প্রাণকে নিজ রশ্মিজালের মধ্যে নিয়ে আসেন। তিনি অনুরূপ ভাবে দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, উর্ধ্ব, অধঃ ও অন্যান্য দিক সমূহে ও জগতের সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন ও তার দ্বারাই প্রাণকে নিজের রশ্মিতে সঞ্জীবিত করেন।

৭ম শ্লোক—স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে। তদেতদ্ ঋচাভ্যুক্তম্ ॥৭

সরলার্থ—সেই সর্বজীবাত্মক, বিশ্বরূপ প্রাণ ও অগ্নি উদিত হয়েছেন। ইহাই ঋক্‌মন্ত্রে বলা হয়েছে।

সূর্যকে বৈশ্বানর ও বিশ্বরূপ বলা হয়েছে। জীব এবং জগৎ তাঁরই প্রকাশ। তিনি প্রাণশক্তি, সকলকে সঞ্জীবিত করেন। আবার তিনিই অগ্নি—সকলের প্রকাশক।

৮ম শ্লোক—বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপন্তম্ ॥৮

সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ প্রাণঃ
প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ ॥

সরলার্থ—অসংখ্য রশ্মিযুক্ত, শত শত প্রকারে বর্তমান, প্রাণিগণের প্রাণ স্বরূপ সূর্য উদিত হন। পণ্ডিতগণ সূর্যকে বিশ্বরূপ, সহস্ররশ্মি বিশিষ্ট, জাতবেদা (জাত পদার্থকে যিনি জানেন) সকলের আশ্রয়, একমাত্র জ্যোতি এবং তাপ প্রদাতা বলে জানেন। সূর্যই জগতের একমাত্র জ্যোতিষ্মান বস্তু, অন্য সকল প্রাণীই সূর্য হতেই তাদের জ্যোতি লাভ করে থাকে।

৯ম শ্লোক—সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ; তস্যায়নে দক্ষিণং চোত্তরং চ। তদ্ যে হ বৈ তদিষ্টাপূর্তে কৃতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমসমেব লোকমভিজয়ন্তে, ত এব পুনরাবর্তন্তে। তস্মাদেত ঋষয়ঃ প্রজাকামা দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এব হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযানঃ ॥৯

সরলার্থ—সংবৎসরই প্রজাপতি স্বরূপ। তাহার দুটি অয়ন, দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ। চন্দ্র-সূর্যের আবর্তন দ্বারা বৎসর, মাসাদি নির্ণয় হয়ে থাকে। যাঁরা ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করেন তাঁরা উত্তরায়ণ পথে সূর্যলোকে গমন করেন। দক্ষিণায়ণ হল চন্দ্রলোকের পথ। চন্দ্রলোক অজ্ঞানের পথ। ঐ পথে যাঁরা চন্দ্রলোকে যান (মৃত্যুর পর) তাঁরা পুনরায় পৃথিবীলোকে ফিরে আসেন। এই কারণে, যে সকল ঋষি সন্তান কামনা করেন তাঁরা চন্দ্রলোকে দক্ষিণায়ন পথে গমন করেন। এই পথই 'রয়ি' বা পিতৃযান নামে কথিত।

১০ম শ্লোক—অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে। এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনম্ এতদমৃতমভয়ং, এতৎ পরায়ণম্ এতস্মান্ন পুনরাবর্তন্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ ॥১০

সরলার্থ—আর অন্য লোকেরা তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা ও বিদ্যা দ্বারা সূর্যরূপ আত্মাকে অন্বেষণ করে উত্তরায়নে। আদিত্যকে জয় করেন অর্থাৎ প্রাপ্ত হন। এই আদিত্যই সমস্ত প্রাণের আশ্রয়, ইহাই অমৃত, অভয়, ইহাই পরমাগতি, ইহা হতে জীব পুনরাবর্তন করে না। ইহাই নিরোধ অর্থাৎ এখানেই যাওয়া আসার সমাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

"সত্য ধর্ম সত্য মোক্ষ সত্য কর্ণধার।
সত্যব্রত পরিপালন জীবের উদ্ধার॥
বাক্যসিদ্ধি হয় তার সত্য মন্ত্র বলে।
ইহকালে পরকালে জয়ী সে সংসারে॥"

—শ্রীতারাচরণ

কান্ত কবি শান্ত কেন

শ্রীঅরুণ কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কান্তকবি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কিন্তু তাঁর গান রচনা বন্ধ হল না। গান গাওয়াও বন্ধ হলো না। ঠাকুর বড় নিষ্ঠুর, এই অভিমান করে কবি গাইলেন :—

তুমি কেমন দয়াল জানা যাবে,
আর কি তুমি আসবে না ?
কাঙ্গাল বলে হেলা করে
হৃদি মাঝে এসে জানাবে না ?
যে নিয়েছে তোমার শরণ
তারে দিলে অভয় চরণ
আমি, ডাকতে জানি না বলে
আমায় কি ভালবাসবে না ?'

কান্তকবি হাসপাতালে রোগ শয্যায় শুয়ে হাজারো যন্ত্রণার মধ্যে সব অভিমান ভুলে আগমনী ও ও বিজয়ার গান গাইলেন :—

কে দেখ্‌বি ছুটে আয়,
আজ, গিরি ভবন আনন্দের তরঙ্গে ভেসে যায় !
ঐ 'মা এল, মা এল' বলে,
কেমন ব্যগ্র কোলাহলে,
'উঠি পড়ি' করে সবাই আগে দেখতে চায়।
নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মেলা
শ্রীপদনখে কচ্ছে খেলা,
(একবার) ঐ চরণে নয়ন দিয়ে সাধ্য কার ফিরায় ?
কি উন্মুক্ত শোভার সদন,
ফুল্ল অমল কমল বদন,
সিদ্ধি, শৌর্য্য, সোনার ছেলে অভয় কোলে তায়।
কান্ত কয়, ভাই নগরবাসি !
তোদের, সপ্তমীতে পৌর্ণমাসী ;
দশমীতে অমাবস্যা, তোদের পঞ্জিকায়।'

প্রিয়তমা কন্যা উমার আগমনে গিরিরাজ মহিষী মেনকা আনন্দে অধীর হয়ে কন্যাকে পরম স্নেহে কোলের কাছে টেনে নিয়ে নানা সুখ দুঃখের কথা বলে চলেছেন :—

'সেই, তমালের ডালে, মাধবীলতারে
গেছিলি, মা, তুলে দিয়ে,
সেই সুলগনে, যেন দুজনার
হয়েছিল, উমা, বিয়ে ;
ঐ সে মাধবী, ঐ সে তমাল,
জড়ায়ে, ঘুমায়ে, ছিল এত কাল
প্রতিপদ হতে পল্লবে, ফুলে,
কে রেখেছে সাজাইয়ে।
তোর নিজ হাতে রোয়া চামেলী, বকুল,
এত ছোট, তবু দিতেছে, মা, ফুল,
ঐ তোর চাঁপা, ঐ যে যূথিকা,
ফুল ডালি মাথে নিয়ে।
ফল, ফুল, কিছু ছিল না উদ্যানে,
মনে হত, যেন মগ্ন তোর ধ্যানে ;—
তোর আগমন, নব জাগরণে
দিয়েছে মা জানাইয়ে।
কান্ত বলে, রাণি, জেনে রাখ খাঁটি,—
বিশ্বের জীবন-মরণের কাঠি
ওরি হাতে থাকে, কভু মোরে রাখে
কভু তোলে বাঁচাইয়ে।'

আগমনী গেল, বিজয়া এল, কন্যা উমা বিজয়া দশমীর দিন কৈলাসে যাবেন। কান্তকবি নবমী নিশার শেষ প্রহর থেকে রাণী মেনকার মনে বিরহের ভাব কেমন তা তিনি সুন্দরভাবে গেয়েছেন :—

আজি নিশা, হয়ো না প্রভাত ;
পীড়িত মরমে আর দিও না আঘাত।
একবার বোঝ ব্যথা, একবার রাখ কথা,
নিতান্ত শোকার্ত, কর কৃপাদৃষ্টি-পাত।
পরিশ্রান্ত কলেবর, হে কাল ! বিশ্রাম কর,
ক্ষণমাত্র, বেশি নহে, আজিকার রাত ;
আমি তো জানি হে সব, অব্যাহত চক্র তব,
অদ্ভিকার মত, গতি মন্দ কর নাথ !
উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি, মলিন হয়ো না আজি,
ধ্রুব হও, দীপ যথা নিষ্কম্প-নিবাত ;
তোমরা পশ্চিমাকাশে, ঢলিলে তো উষা আসে'
তোমরা মলিন হলে, শিরে বজ্রাঘাত।
চির নিষ্ঠুরের ছবি, দশমী প্রভাত রবি !
তুইও কি উদিত হবি ? বিধির জল্লাদ !
কান্ত বলে, রাজমহিষি ! পায় না যাকে
যোগিঋষি,
তিন দিন সে তোমার বুকে,—তবু অশ্রুপাত ?"

কন্যা উমা কৈলাসে চলে গেলেন। মেনকা শোকে কাতর। কান্তকবি মেনকার মনের গভীর বেদনা কেমন সুন্দর ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন :—

(ঐ) মা-হারা হরিণ-শিশু, চেয়ে আছে
পথপানে।
অশ্রু ঝরিছে শুধু, কাতর দু নয়নে।
(ঐ) হংস-সারস-কুল- মলিন মুখে,
বুঝাইতে নারে কি যে বেদনা বুকে।
কি সোহাগে খেতে দিত, অন্ন নয়
সে অমৃত,
সে মা কোথা চলে গেছে বড় ব্যথা
দিয়ে প্রাণে।
(ঐ) শুক, শ্যামা এ কদিন 'মা' 'মা' বলে,
পড়েছে উমার বুকে, সোহাগে গলে ;
চলে গেছে নয়ন তারা। আহার ছেড়েছে
তারা
(যেন) জিজ্ঞাসে নীরব ভাবে, মা গিয়েছে
কোনখানে ?
নয়নের মণি, সে যে সকলের প্রাণ।
চলে গেছে, পড়ে আছে নীরব শ্মশান :
কেমনে পাইব আর, মা আমার,
মা আমার !
কান্ত বলে, প্রাণ দে মা, পুনঃ দরশন
দানে।

রজনীকান্ত কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলেন। কিন্তু লেখনী তাঁর সচল ছিল। তিনি হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে বসে একটার পর একটা গান রচনা করতে থাকেন। তাঁর প্রবল জ্বর, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট' একটানা কাশির প্রাণান্ত-কার যন্ত্রণা, এর ওপর কোন কিছু খেতে খুব কষ্ট। কিন্তু এসব কোন বাধাবিঘ্ন তাঁর লেখনী থামাতে পারেনি। হাজারো দৈহিক যন্ত্রণা তাঁকে মর্মান্তিক কষ্ট দিয়েছে, কিন্তু তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেছেন। গীত রচনা করেছেন, বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। একথা সত্য, রজনীকান্তের সংগীত সম্ভার যদি রচনা না হত, বাংলা সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডার অনেকখানি শূন্য থেকে যেত। শরীর অসুস্থ, মন অসুখী, যদিও এ অবস্থায় ভাল গান রচনা করা সম্ভব নয় কিন্তু কান্তকবি অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি সুললিত সুমধুর সব সঙ্গীতের জন্ম দিয়েছেন। হাসপাতালের রোগ-শয্যায় শুয়ে হাজারো যন্ত্রণার মধ্যে তিনি অনবদ্য সব সঙ্গীত রচনা করেছেন।

কান্তকবি লিখলেন 'করুণাময়' নামে এক অনবদ্য গান :—

(আমি) অকৃতী অধম বলেও তো, কিছু
কম করে মোরে দাওনি।
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া
কেড়েও তো কিছু নাওনি!
(তব) আশীষ-কুসুম ধরি নাই শিরে
পায়ে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে;
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাওনি।
(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধা পান করে, মরি গো পিয়াসে;
তবু, যাহা চাই সকলি পেয়েছি;
তুমি তো কিছুই পাওনি।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শত-বার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ,—ফিরে চেয়ে দেখি
এক পা-ও ছেড়ে যাওনি।'

(ক্রমশঃ)

অষ্টম কিস্তি

লাদাখ ঘুরে এলাম

মাধুরীসুধা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরদিন মোটামুটি সাড়ে সাতটায়সেজে গুজে তৈরী হয়ে ভীষণ স্ফূর্তি নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। আমরা সামনে ড্রাইভার হামিদভাইয়ের পাশে। পিছনে অন্যরা। আমি গান গাইতে গাইতে গলা শুকিয়ে, জল খেয়ে, আমলকি খেয়ে, রাস্তা অর্ধেক করে ফেললাম। যাচ্ছি লে থেকে মাহের রাস্তায়। শে প্যালেস ও থিকসে গুম্ফা পেরিয়ে কারু থেকে পাশের রাস্তায় গিয়ে ১৪,৪০০ ফিটের উচ্চতায় প্যাংগং লেকের রাস্তায়। কারুর চেকপোষ্টে সরকারী অনুমতিপত্র নিতে হয়। ভারতীয় সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে বলে অনুমতি ছাড়া এই রাজ্যে ভ্রমণ বেআইনী। যেতে যেতে সম্পন্ন চাষীদের ক্ষেতখামার নিয়ে অত্যন্ত সাজানো সুন্দর এবং বিশাল এক গ্রাম দেখতে পাওয়া গেল—যার নাম শক্তি। নদীর জলকে সেচের কাজে ব্যবহার করে চাষবাসের সুন্দর ব্যবস্থায় পুরো গ্রাম সবুজ। রুক্ষতার শুষ্কতার অবসান এই গ্রাম। এর পাশের পাহাড়ী রাস্তা ধরে আমরা উপরে উঠে যাই। অ-নে-ক উঁচু থেকে এই সবুজ গ্রামের চৌহদ্দি একটা ছোট্ট ছবির ফ্রেমে ধরা থাকল। পাহাড় বেয়ে যতই উপরে উঠতে থাকি চারপাশে দৃশ্যাবলী বদলে যেতে থাকে। কোথাও বরফের পাহাড়ের সারি দূরে। কোথাও ভাঙ্গাচোরা পাহাড়ের ঢাল। এইভাবে চলতে চলতেই হঠাৎ করে যেন চলে এল ১৭,৮০০ ফুট উচ্চতার চাংলা। বিশ্বের তৃতীয় উচ্চতম চাংলা-পাস বরফে ঢাকা। জীবনে প্রথমবার বরফের সামনে, আমি তো অভিভূত। মনের আনন্দে চাংলা বাবার মন্দিরে পূজো দিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে, মিলিটারীদের দেওয়া গরম চা খেয়ে বরফে উঠে পড়লাম, হাঁটলাম, বসলাম, থাবা মেরে মুঠো করে তুললাম—ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেললাম। মনে হচ্ছিল সটান শুয়ে পড়ি। প্যাগলের মত আনন্দ হচ্ছিল।

ছেলেমানুষের মত বরফ নিয়ে খেললাম, আনন্দে গাইলাম সবাই হাত ধরাধরি করে 'আয় তবে সহচরী' নাচলামও—এই বুড়োবয়সে ভীষণ খুশি হলাম। চেঁচিয়ে সমস্ত বিশ্বকে জানাতে ইচ্ছে হল "হৃদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম।" নিঃশব্দে প্রণাম জানালাম সাধুবাবা সাধুমাকে। তাঁদের জন্যই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। আমার শারীরিক অসুস্থতার উপর মনের জোর চাপিয়েছি আশীর্ব্বাদী ফুল আর সকলের শুভেচ্ছা দিয়ে। নইলে কখনোই পারতাম না এত সুন্দর জায়গায় এত সুন্দরভাবে এসে দাঁড়াতে। চলে আসার আগে আবার গেলাম মন্দিরে প্রণাম করতে। সকলের মনস্কামনা পূর্ণ হোক। যেমন আমার হয়েছে। শরীরে যেন নতুন উদ্যম, নতুন বল খুঁজে পেলাম। গাড়ী নিয়ে এসেছে সবুজের দেশ ছেড়ে ধূধূ মরুভূমির মত বালিয়াড়িতে। তারমধ্যে জেগে আছে নীল জলের হ্রদ প্যাংগং। হাওয়া ছিল প্রচণ্ড। রোদ ততোধিক। তাই তেমন ঠাণ্ডা লাগল না। নেমে আমরা প্রথমেই গেলাম খাবার ব্যবস্থা করতে। লাদাখী চা খেলাম হামিদ ভাই এর কল্যাণে। শরীরের ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। তারপর খেলাম চাউমিন আর স্যুপ। আমি ছটফট করছি লেকে যাবার জন্য। আমাদের দলের লোকেরা আগে লেক দেখে তারপর খেতে ঢুকেছে। বরং ভালই হয়েছে। নিরালায় নিভৃতে আমি দেখতে পারব। ১৪,৪০০ ফুট উঁচুতে এটি ভারতের বৃহত্তম নোনতা জলের লেক, প্রস্থে প্রায় চার কিলোমিটার। আর লম্বায় একশ চল্লিশ কিলোমিটার। এর তিনভাগের একভাগ মাত্র ভারতে বাকী অংশটুকু চীনে।

যত দ্রুত যাওয়া সম্ভব আমি গিয়ে লেকের কিনারে দাঁড়ালাম। আকাশ নীল—তার পুরো রংটাই যেন জলে ঢেলে দিয়েছে। এত নীল ছবিতে ছাড়া দেখা যায় না—অবিশ্বাস্য! লেকের পিছনে বরফের পাহাড় দাঁড়িয়ে সারি সারি—সেও যেন আঁকা ছবি। যেদিকে দুচোখ যায়—সুন্দর। একটি দুটি সামুদ্রিক চিলের মত পাখি ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। খাবার হোটেল, কোলাহল অনেক দূরে। স্তব্ধতার গান শুনলাম কিছুক্ষণ। খালি পায়ে জলে পা ডুবিয়ে সামান্য উঁচু একটি টিলার উপর গিয়ে দাঁড়ালাম। স্বচ্ছ জলে প্রত্যেকটি বালুকণা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এত পরিষ্কার। নুড়ি পাথরে কোন শ্যাওলা নেই। যেতে গিয়ে পা কেটে গেল কিন্তু টের পেলাম না। জল বরফের মত ঠাণ্ডা। গিয়ে টিলার পাথরে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালাম মনে হল আমি একা। এই বিশ্বে আমিই প্রথম এই অপূর্ব সৌন্দর্য অবলোকন করছি, অনাস্বাদিত বায়বীয় পরশ উপভোগ করছি। আমার পিছনে পড়ে আছে পৃথিবী—আমি স্বর্গের দ্বারে দাঁড়িয়ে। মন্ত্রোচ্চারণ করলাম—ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব। যাঁর কল্যাণে ও আশীর্ব্বাদে এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করলাম। দূরে বরফের পাহাড়ের দিকে মুখ করে নীলজলে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললাম—"দীপ্তজ্ঞানের মূর্ত মহিমা শুদ্ধ শান্তনীড়ে, মন্দির মাঝে যোগাসনে বসি জাহ্নবী নদীতীরে, শতেক ভক্ত বহিয়া এনেছে শত পূজা উপচার, আমি শুধু সেই যোগীর চরণে প্রণমি বারংবার।" বারবার বললাম—হে করুণাময়, তোমার করুণায় এই

অপূর্ব সৌন্দর্য আমার সামনে, আমি যেন অবগাহন করছি। নিজেকে ধন্য মনে হল। আনন্দে চোখে জল পড়তে লাগল অবিরাম। আমি গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলাম—প্রভু আমার, প্রিয় আমার, পরমধন হে। হৃদয় বাসনা পুর্ণ হল আজি মম। শোনালাম—পাহাড়কে, নীলজলকে, দূরের আকাশকে। মনে মনে বললাম—আমার এই বার্তা তোমরা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য কর। সে যে কি অদ্ভুত আনন্দ, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। শরীরে মনে ব্যথা বেদনা কিছুই নেই. আমি যেন সম্পূর্ণ সুস্থ। বাকী জীবনটা এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি এই নির্মল আনন্দধারা বয়ে যাওয়া ভুবনে। আমার মা বাবাকে স্মরণ করলাম ও প্রণাম জানালাম। সমস্ত গুরুজনকে মনে মনে প্রণাম জানালাম ও আশীর্বাদ ভিক্ষা করলাম। সকলের কৃপাই আজ আমাকে এখানে এনেছে। এই অপূর্ব দৃশ্য নিজের চোখে দেখব—এ তো আমি কল্পনাও করিনি। টিলা থেকে নামতে ইচ্ছে করছিল না। সঙ্গের লোকজন ডাকাডাকি করে যেন আমাদের ধ্যান ভাঙাল। ফিরতে হবে। যতদূর যাবার অনুমতি আছে গাড়ী করে যাওয়া হল। তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ফেরা। (ক্রমশঃ)

MIND

by

Dr. A. K. Bandyopadhyay

Mind is in the domain of psychology but it is also important in spiritual matter, as without control or regulation of mind nothing can be achieved. Mind is the "spiritual eye'—mind helps us to see in spiritual matters. Mind, in modern English, means 'the element or complex of elements in an individual that feels, perceives, thinks, wills and especially reasons.' It also means 'the organised, conscious and unconscious adapted mental activity. It covers different mental faculties, opinion, view, disposition, mood etc., Mind has two facets—the outer mind or 'Manas' which faces the objects in the world and is called the obiective mind which functions through the senses of touch, sound, form, taste and smell and the inner mind which is called the subjective mind or 'Buddhi'. Besides, there are terms called 'Chitta' which thinks and 'Manas' which functions through the senses of touch, sound, form, taste and smell and faces objects in the world and reacts to and store thoughts in the mind. In healthy human beings the objective and subjective sides of the mind work in unison with each other and in moments of uncertainty the objective mind comes under the disciplining influence of the subjective mind. But the split between subjective and objective is created by our egoistic desires. The two phases of the mind create inner confusion between the two

because 'of ego' in us and low desires. The two phases of the mind get various stimuli and impulses. Through our sense of perception we experience the world of objects around us through various stimuli, and impulses which react with our sense-organs. Impulses created reach the objective mind and filter deep down to the subjective stratum through Individual ego-centric desires or 'Vasanas'. These impulses in the subjective mind of a person, react with the existing impressions of his own past actions which lie carefully store away in the subjective layer and express themselves in the world outside through the five organs of action. For each activity a person meets with different patterns of stimuli and in the subjective mind constantly gathers new impressions. They also get coloured by the quality of different 'Vasanas'. The actions followed through carry a flavour of the existing 'Vasanas' or desires in the subjective mind which gets increasingly granulated by the overlapping signatures of our own past moments. These granulations of the subjective create a wall between ourselves and the spiritual being that shines eternally as Pure Consciousness. The reduction of the 'Vasanas' is the means of volatilising the mind. The subjective mind cannot realise man's divine spiritual nature because of dull 'Vasanas' gathered by mind. The Bhagvadgita says that by disciplining the objective mind, it can be ensured to act faithfully as per guidance received from the subjective mind. We should only remove the driving factor of ego-centric desires Through intelligent action an individual can exhaust existing harmful impressions and the subjective mind would then become clear and crystalline. Selfless activity without a sense of ego and adherence to a divine ideal, would lead to an inner purification of mind. An unhealthy mind leads to many psychological and other ailments. There is constantly a battle with our 'Vasanas' and through inner purity and selfless activity and by following our 'Swadharma' we shall get purged.

For self-development and self-perfection verses 10-15 and 18-20 of Chapter-VI of the Bhagvadgita, talk of meditation by controlling or restraining the mind. It requires constant practice in solitude, with the mind and body controlled, and making it one-pointed. A 'controlled mind' should be like a lamp placed in a windless place and does not flicker. 'Yoga' or union with Brahman should be practised with determination and with a mind steady and undespairing. With the quietude of the mind, gained through concentration, we would then re-discover ourselves and about our identity with the Self, who is absolute bliss. Mind is difficult to control and is restless, but, by practice and dispassion it can be retrieved (V. 25 Chp. VI).

'Vasanas' may be good or bad thoughts As long as thoughts are flowing, the mind survives – whether good or bad. To obliterate all 'Vasanas' completely is to stop all thoughts or total cessation of thought-flow viz. mind. Verses 54 - 56 of Chapter II of the Bhagvadgita refer to 'Sthitaprajna' and 'Sthitadhi' i. e God - realised soul, stable of mind and established in 'Samadhi' or perfect tranquillity of mind. The state of firm consciousness is normal and effortless—a person gives up thoroughly and abandon all cravings of the mind. The mind of a 'Sthitadhi' remains unperturbed in sorrows and he has no thirst for pleasures, he is free from passion, fear and anger. The real nature of man is consciousness and at the supreme level of consciousness there is only God. The science of the Self clearly recognises one's true nature as Being - Consciousness.

Everyone can have a vision of God. The ultimate aim of human birth is to understand that one's true nature is divine and this consciousness is one's true nature. 'I' or 'Self' - realisation' is self - luminous and pure. Brahman or the Self luminosity is pure Brahman—the self - luminosity is the very nature of Brahman and it is a quality which is exclusive to Him. This is what the sage Ramana Maharshi of south India used to say. Heart (or call it Mind) is the abode of the Supreme Brahman. We should distinguish between Real and Unreal—the Unreal has no existence and the Real never ceases to be (Gita—Chap. II v. 16). It is ignorance to regard the Real as Unreal and Unreal as Real. The 'I' naturally shines within ourselves as consciousness. Attention turned towards the body causes the distinction between Real and Unreal—between 'you' and 'I' and with consciousness. Through self - attention, it i. e. attention turned towards the body is itself transformed into being - consciousness itself, and if we realise that the reality is only over there and there is no scope for 'You' and 'I'. But for consciousness nothing is revealed and illumined. This consciousness is the nature of the illuminating Self. The Supreme Self when externalised becomes our mind. 'Jnana' or knowledge of 'God' does not come from outside or from another person—it can be realised by each and every one in his own Heart. Ramana Maharshi taught that the ultimate aim of a human birth is to understand and know God—our true nature is divine and this consciousness is one's true nature and Self-realisation comes through self-surrender. What is the nature of such self-surrender ? There are many differences among people—but in their ignorance they refer to the body as 'I'. Actually, the 'I' is consciousness. We know being-conscious only through inward enquiry about its real nature. Self - enquiry as to 'Who am I ?' is indispensable for investigating clearly the nature

and modifications of 'Being-cosciousness'. The source of Being - cosciousness always revealing as 'I' is the only self-luminous, pure Brahman. Being - consciousness, the nature of Brahman is not different from Brahman. This Being - consciousness, the nature of Brahman, is not different from Brahman. This Being - consciousness or Supreme Self has its abode in our hearts. The body is never the 'I', and if we think so it will be a false identification. Man's real nature is consciousness which transcends all the senses and the mind. 'Jnana' helps us to realise this truth. To experience one's real nature, ignorance has to be dispelled. The unreal has no existence and the real is never non-existent and this is the truth. In the Upanishads we have prayers like 'Asato ma sad gamayo Tamaso ma jyotirgamaya' (Lead us from unreal to real ; from darkness to light). In Tamil religious literature it is said : 'The mind is merely thoughts. Of all thoughts 'I' is the root. Therefore, the mind is only the thought 'I'. The mind is a bundle of thoughts. As the root of the mind is ego, destruction of the ego is the annihilation of mind. When the mind increasingly investigates its own nature, it transpires that there is no such thing as mind. When does this 'I' arise ? Seek for it within. It then vanishes. This is the pursuit of wisdom. The extinction of 'vasanas' is the end of 'Sadhana'. Ignorance takes the form of 'Vasanas' and all 'Vasanas' have as their root in the I - am - the -body 'Vasana'. Mind has three 'Gunas' (aptidudes or qualities)— Sattva Rajas and Tamas. When 'Sattva' predominates it is known as formless mind i. e. the Supreme Self. When 'Rajas' and 'Tamas' predominate it is known as 'mind with form' the individual self. In consciousness there are two different powers, part and whole i.e, 'mind with form' and 'mind without form,' Mind with form is present in the ignorant and mind without form is present in 'Jnanis'.



মনসা-মঙ্গল-সমাচার

কবিরত্ন শ্রীসুধীর গুপ্ত

—১— সাম্য-বাণিজ্যেতে যায় চাঁদ-সদাগর,
ভাসে তা'র চৌদ্দ ডিঙা সাথে মধুকর,
সমতায় সুদীক্ষিত মাঝিরা সুন্দর,
সব কিছু পরিপাটী · অতি মনোহর,
চম্পকের বাসিন্দা যে এরা সকলেই—
মৈত্রী - ভাব - ভরপুর—অসমতা নেই।

—২— নৃত্য - রঙ্গ - ভঙ্গময় গাঙুড়ের জল,
গৃহ - রত্ন সোনাকার আঁখি ছল ছল্—
দম্পতির দিব্য প্রীতি মধুর - অমল,
চন্দ্র ধর - চিত্ত রাখে নির্মল · সবল।
রত্নাকর - ডাকে চাঁদ বাণিজ্যেতে যায়,
পৌরুষ - চৈতন্য শিব চরিত্রে যোগায়।

—৩— সর্পদেবী বিষহরি অসাম্যের বিষ
ছড়ায়ে যে বিষায়িত করে অহর্নিশ,
সাম্য - সংসাধক লভে কালের আশিস,
সংকটে যে রক্ষে তা'রে মহেশ-যতীশ।
সর্প · দষ্ট ছয় সুত হারায় জীবন,
সমতার বণিকের শক্তি অতুলন।

—৪— বিবাহ - বাসরে সর্প - দষ্ট লক্ষ্মীন্দরে
বাঁচায় বেহুলা সতী মহেন্দ্রের বরে,
নৃত্য - সাম্য মনসার-ও মন জয় করে,
শিবেরই প্রতিষ্ঠা হয় চম্পক - নগরে।
চিরন্তন লয়োদয় অসাম্য - নাশক,
মহাকাল - লীলাই যে ঐক্য - সংসাধক।

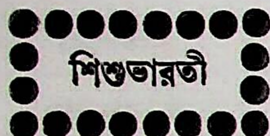
—৫— মনসার মানসের বিবর্তন - কথা
অমঙ্গল - নাশকর দানে যে বারতা,
সর্ব - বিষ - হর দিব্য মিত্রতা · সমতা
বিকশিত করে ভবে পূর্ণ মানবতা,
বেহুলার স্বর্গ - নৃত্য প্রাণ - সঞ্জীবক,
মনসামঙ্গল - কাব্য সাম্যের দ্যোতক।

প্রভু

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে নিয়ে আর খেলোনা খেলা,
এবার আমার সময় হল তোমার সাথে মেলা।
এতকাল তো আছি বসে তোমারই পথ চেয়ে,
দাওগো তোমার চরণ ছুঁতে, তোমারই গান
গেয়ে।

আর পারিনা প্রভু আমি এবার কোলে নাও,
তোমার কাছে নাওগো টেনে, তোমার শরণ দাও।



গুরু পূর্ণিমায় গুরুপূজা

শ্রীমতী যূথিকা সিন্‌হা

আজি গুরু পূর্ণিমাতে
গুরুর পূজায়
সকলেই রত আজি
গুরু বন্দনায়।
গুরু ব্রহ্মা ; গুরু বিষ্ণু
গুরু মহেশ্বর
গুরু মাতা, গুরু পিতা,
গুরু সর্বেশ্বর।
আলোর দিশারী তুমি
ঘুচায়ে আঁধার

আলোকিত কর প্রভু
অন্তর আমার।
গুরু জ্ঞান, গুরু ধ্যান
গুরু কর সার
গুরুর চরণ বিনা
গতি নাহি আর।
জয় জয় গুরুদেব
জয় ভগবান
ভক্তি নম্র চিত্তে পূজি
তব শ্রীচরণ॥

সাধক গায়ক দিলীপ কুমার রায়

রাম ভট্টাচার্য (প্রয়াত)

প্রখ্যাত নাট্যকার, গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্র লাল রায় বা ডি, এল, রায় বাংলার গৌরব। তিনি কবি, সাহিত্যিক ও উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারি। তাঁর গান "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা" বা "পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে" এখনও আমাদের মনে আনন্দ দেয়।

তাঁর পুত্র দিলীপ কুমার রায়ের বিষয় কিছু বলতে বসেছি। তিনি বিলেত গিয়ে লেখাপড়া করা ছাড়াও নানান দেশের গান বাজনা শিখে এসেছিলেন। তাঁকে আমি আমার খুব ছোট-বেলা থেকে অনেকবার খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি ছিলেন আমার কাকা সাহিত্যিক গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্যের বন্ধু ও সহপাঠী।

দিলীপ বাবুকে দেখতে খুব সুন্দর, ফর্সা রং একটু লালচে আভা, মাথায় বড় বড় চুল, চোখে চশমা। তিনি আমাদের বাড়ী এলে, বৈঠকখানা ঘরে বসে গান গাইতেন। অতি মধুর কণ্ঠে—তাঁর নিজের লেখা গান, তাঁর পিতৃদেবের গান মাথা নেড়ে নেড়ে গেয়ে যেতেন। পাড়া প্রতি-বেশিরা ভীড় করে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতো। তখনও আমাদের বাড়ীতে ইলেকট্রিক আসেনি। আমরা ছেলেরা হাত পাখা ঘুরিয়ে তাঁকে বাতাস করতাম। ঘরে কড়ি কাঠ থেকে চার পাঁচটি লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিয়ে ঘর আলোকিত করা হত আর ঝালর দেওয়া ঝোলানো টানা পাখা টানা হত। পাড়ার পরিচিত সঙ্গীত শিল্পী গোপাল সেনগুপ্ত (অন্ধ গায়ক) ও উমাপদ ভট্টাচার্য্য এসে গান শুনতেন।

দিলীপ কুমারের গাওয়া গান, 'বৃন্দাবনের লীলা অভিরাম" "জ্বলবার মন্ত্র দিলে মোরে",

'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই, "তুমি যে হে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালোবাসি' রাঙাজবা কে দিল তোর পায়, ওই মহাসিন্ধুর ওপার হতে" প্রভৃতি গান এখনও শুনলে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

তাঁর লেখা উপন্যাস 'দোলা' এক সময় বাংলা সাহিত্যে সাড়া জাগিয়েছিল। একদিন তিনি গঙ্গার ধারে সাহিত্যিক হেমেন্দ্র কুমার রায়ের বাড়ী এসেছিলেন। হেমেন দা বাবাকে গান শুনতে ডেকে পাঠালেন। আমি আর দাদা সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। হেমেনদার ছোট বাড়ী বহু বিখ্যাত লোকে ভরে গেল। আমরা সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসলাম। তিনি হাসির গান "ভ্যালারে নন্দলাল," "বিস্যুদ্ বারের বার বেলায়" থেকে শুরু করে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গান গেয়ে সবাইকে অভিভূত করে দিলেন।

হঠাৎ তিনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচারী আশ্রমে চলে গেলেন। বহুদিন বাদে তিনি কলকাতায় একবার এসেছিলেন। পশ্চিম বাংলার তৎকালীন রাজ্যপাল ধর্মভীরাকে সভাপতি করে তাঁর এক গানের আসর করা হয় রবীন্দ্র সদনে। তিনি কাকার কাছে এসে কার্ড দিয়ে গান শুনতে যাওয়ার আমন্ত্রণ করেছিলেন। কাকা অসুস্থ থাকায় আমি সেই কার্ড নিয়ে গান শুনতে গিয়েছিলাম। তাঁর গান খুবই মধুর লাগলো কিন্তু ওই বয়েসে সে গানের গমক, নীড়, সঞ্চালন আগেকার মত মনে হল না। শেষ গানটি কিন্তু কানে বাজে—"অনেক ভালো করেছো মা আর ভালোতে কাজ নাই, —এবার ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে তাঁকে দেখেছি। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের কোনো কথার প্রতিবাদে তাঁকে বলতে—"আপনি এটা কি বলছেন রবিবাবু?" আমরা অবাক হয়ে যেতাম কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বিচলিত হতে দেখিনি। পণ্ডিচেরী আশ্রমে থাকতে তিনি ও কবি নিশিকান্ত অনেক গান লিখেছিলেন। তারপর তিনি আশ্রম ছেড়ে গিয়ে পুনায় নিজের আশ্রম গড়ে সেখানেই সাধন ভজন করতেন। বিদেশী "কৃষ্ণ প্রেম" তাঁর আশ্রমে এসেছিলেন এবং থেকেছিলেন।

সাধক দিলীপ কুমার রায় তাঁর পুনার আশ্রমেই সাধন ভজন করতে করতে চির সমাধি লাভ করেন। বাংলার এক উজ্জ্বল রত্ন পৃথিবী ছেড়ে কোন অজানা লোকে যাত্রা করলেন।

হারানো সাথী

বিগত দিবসে আমরা যাঁদের হারিয়েছি—

১৮-৭-২০০৮ শ্যামাপ্রসাদ মতিলাল

২৪-৭-২০০৮ অজিত কুমার ভদ্র

এঁদের পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত স্বজনবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁদের পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করছি।

মঠের সংবাদ

রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী—বিগত ২৫শে মে, ২০০৮ রবিবার সন্ধ্যায় কলিকাতা শ্রীতারামঠে তারাচরণ অরণ্যকুমারী বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি, নৃত্য ও গীত সহকারে অনুষ্ঠিত তাহাদের অনুষ্ঠান সমবেত সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

সুকুমারী রায় চৌধুরী স্মৃতি দিবস—কলিকাতা শ্রীতারামঠে বিগত ১০ই জুন, ২০০৮ মঙ্গলবার সুকুমারী রায় চৌধুরী স্মৃতি দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত দিবসে ক্ষুদ্রাকারে ভক্তসেবা ও নর-নারায়ণ সেবা করা হয়। শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ তিনি নিজ বসতবাটিটিও আশ্রমকে দান করিয়া গিয়াছেন—সেকথা আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

গুরুপূর্ণিমা :—বিগত ১৮ই জুলাই, ২০০৮ শুক্রবার কলিকাতা শ্রীতারামঠে যথাবিহিত আড়ম্বর সহকারে শ্রীশ্রীগুরু পূর্ণিমা উদ্‌যাপিত হয়। এই উপলক্ষে উক্ত দিবসে পূর্বাহ্নে পূজা ও মধ্যাহ্নে ভক্তসেবা হয়। বহু ভক্ত সমাগমে উক্ত দিবসে সমগ্র আশ্রম প্রাঙ্গণ আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে।

শ্রীশ্রীসাধুবাবার তিরোধান তিথিপূজা—বিগত ২১শে জুলাই, ২০০৮ সোমবার কলিকাতা শ্রীতারামঠে সাধুবাবা শ্রীশ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেবের ৬০তম তিরোধান তিথিপূজা যথাবিহিত আড়ম্বর সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে পূর্বাহ্নে পূজা, পাঠ, আরাত্রিক ও হোম, মধ্যাহ্নে ভক্তসেবা ও নরনারায়ণ সেবা এবং সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন 'অঙ্কুর' গোষ্ঠির শিল্পী সর্বশ্রীমতী অঞ্জলি রাণা, অঞ্জলি দত্ত, গীতা নন্দী, গোপা বর্ধন ও স্বাগতা মণ্ডল। তবলায় সহযোগিতা করেন সর্বশ্রী অরবিন্দ প্রধান ও সুব্রত শ্যামল। অনুষ্ঠানটির ভাষ্য রচনা ও পাঠ করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা সেন। তাহার পর শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী পরিচালিত দুর্গানাম কীর্তনের সঙ্গে উক্ত দিবসের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

রবিবাসরীয় সভা :—

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ তারিখে।

২-৯-২০০৭ : বিষয়—"ত্রৈলঙ্গস্বামী"। সভাপতি—শ্রীসুনীল রাহা। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত, শ্রীমতী কল্যাণী মিত্র ও শ্রীমতী দীপা ভট্টাচার্য্য। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

৯-৯-২০০৭ : বিষয়—"শ্রীশ্রীসাধুমা"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত, শ্রীউত্তম অধিকারী ও দেবশ্রী ভট্টাচার্য্য। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন।

১৬-৯-২০০৭ : বিষয়—"পরদুঃখকাতরতা"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত, শ্রীমতী অরুণা দত্ত, শ্রীমতী রুণু ব্যানার্জী ও শ্রীউত্তম অধিকারী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন।

২৩-৯-২০০৭ : বিষয়—"স্বামী ভাস্করানন্দ"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত, শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত, শ্রীউত্তম অধিকারী শ্রীঅজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

৩০-৯-২০০৭ : বিষয়—"দুর্গাপূজার আবশ্যকতা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী, শ্রীমতী পায়েল দত্ত ও শ্রীমতী অরুণা দত্ত। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ৭ ও ১৪ তারিখে। ২১শে অক্টোবর বিজয়া সম্মিলন উপলক্ষে রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় নাই এবং ২৮শে অক্টোবর শ্রীশ্রীসাধুমায়ের জন্মোৎসবের জন্য রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় নাই।

৭-১০-২০০৭ : বিষয়—"মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী"। সভাপতি— রামানন্দ সেন। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীউত্তম অধিকারী, ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত ও শ্রীশিবনাথ ব্যানার্জী। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী ও ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১৪-১০-২০০৭ : বিষয়—"মহালয়া"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীশিমূল ঘোষ ও শ্রীউত্তম অধিকারী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপম। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ৪, ১১, ১৮ ও ২৫ তারিখে।

৪-১১-২০০০ : বিষয়—"শ্রীশ্রীসাধুমা"। সভাপতি—শ্রীরামানন্দ সেন। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত, শ্রীউত্তম অধিকারী, শ্রীমতী রুনু ব্যানার্জী। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন।

১১-১১-২০০৭ : বিষয়—"শ্রীশ্রীসাধুমা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী সুধা দাশ। বক্তা—শ্রীদীপক রঞ্জন চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন।

১৮-১১-২০০৭ : বিষয়—"শক্তিপূজা"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী রাণী ব্যানার্জী ও শ্রীমতী আরতি দাশগুপ্ত। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন।

২৫-১১-২০০৭ : বিষয়—"শক্তিপূজা"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত ও শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

কলিকাতা শ্রীতারামঠে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় রবিবাসরীয় সভার অধিবেশন হয় যথাক্রমে ২, ৯, ১৬, ২৩ ও ৩০ তারিখে।

২-১২-২০০৭ : বিষয়—"রাসলীলা"। সভাপতি—শ্রীরামানন্দ সেন। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত ও শ্রীউত্তম অধিকারী। বক্তা—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

৯-১২-২০০৭ : বিষয়—"বিদ্যাসাগর"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী সুধা দাশ ও শ্রীমদন মোহন বাইরী। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

১৬-১২-২০০৭ : বিষয়—"মনের জোর"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী অরুণা দত্ত, শ্রীসলিল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

২৩-১২-২০০৭ : বিষয়—"যীশুখৃষ্ট"। সভাপতি—ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। প্রথমে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী জয়শ্রী মুখার্জি, শ্রীমদনমোহন বাইরী, শ্রীউত্তম অধিকারী ও শ্রীসুনীল রাহা। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

৩০-১২-২০০৭ : বিষয়—"শ্রীরামকৃষ্ণ"। সভাপতি—শ্রীঅমল কুমার রায় চৌধুরী। প্রথমে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পর সঙ্গীত—শ্রীমতী সুধা দাশ। সভাপতির ভাষণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন। দুর্গানাম কীর্তন—শ্রীবিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী।

সাধুবাবা শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের

ও

সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর

শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য—

ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সরসীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতিতে

নিবেদিত

নিবেদক

নয়াদিল্লী সত্যসঙ্ঘ

দূরভাষ :—

২৬৩৪৯৯৮৯, ৯৮১০১২৪৮৪১, ৯৮৯১৭২২৯১১, ৯৮১১০৯০৬৮৭

"সততা আছয়ে যথা চরিত্র ও, পবিত্রতা
জেনো তথা আছে ভগবান।
অসীম সসীম রূপে আকাশে বাতাসে চুপে
জাগরিত বাক্‌শক্তি প্রাণ॥"

—শ্রীতারাচরণ

15th AUGUST—2008 REGISTERED SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-190/2007-09
সত্যসাথী শ্রাবণ ১৪১৫ R. N. I. No. 2677/57

ভাবসিন্ধু ৺নির্ম্মল চন্দ্র বড়ুয়া রচিত—

১।	সাধনার আলো (২য় সংস্করণ)	১০ টাকা
২।	শ্রীশ্রীমা অরণ্যকুমারী (২য় সংস্করণ)	১০ টাকা
৩।	অমৃত পরশ	৫ টাকা
৪।	স্মরণ	৪ টাকা
৫।	শ্রীপদ ছায়ায়	২০ টাকা
৬।	প্রাণের ঠাকুর	২২ টাকা
৭।	চিরসাথী হে অমৃতময়	১২ টাকা
৮।	শ্রীশ্রীতারাচরণ কাব্যসম্ভার (আদি পর্ব)	১০ টাকা
৯।	ঐ (মধ্য পর্ব)	১৬ টাকা
১০।	স্মৃতির আলোয় সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী	২০ টাকা
১১।	The Message of Sri Sri Sadhubaba Taracharan Paramahansa	১ টাকা
১২।	অমোঘ আহ্বান	৫ টাকা

শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

R. R. BANERJEA, B.Sc.

Sri Sri Sadhu Taracharan Paramahansadev— Rs. 10.00

প্রেমনিধি ৺উপেন্দ্রনাথ ঘটক রচিত—

শ্রীশ্রীমাতাজীর তীর্থ ভ্রমণ ৫.০০

৺অনিলবরণ চোধুরী রচিত—

১।	সাধুবাবা শ্রীতারাচরণ পরমহংস (৩য় সং)	১৫.০০
২।	সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী	৫.০০
৩।	শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (গীতি আলেখ্য)	২.০০
৪।	তুষার-তীর্থে (২য় সং)	১০.০০

৺বীরেন্দ্র নাথ ঘটক রচিত—

অমৃত লহরী (১ম খণ্ড) ৪.০০
ঐ (২য় খণ্ড) ৩.০০

ব্রহ্মানন্দ ৺ব্রহ্মনাথ সুর রচিত—

দেব-সন্নিধানে (২য় সং) ১৫.০০

৺ব্রজেন্দ্র লাল কানুনগো প্রণীত—

সাধু তারাচরণ (২য় সং) ৫.০০

৺যামিনীকান্ত সেন প্রণীত—

সঙ্গীতা (২য় সংস্করণ) ৫.০০

৺শচীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত—

সাধুবাবা শ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী (দ্বিতীয় সং) ২.০০

৺কমলা দেবী বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—

রত্নাবলী (২য় সংস্করণ) ১০.০০

শ্রীসুনীল রাহা রচিত—

সবার মা সাধুমা ১০.০০

Late DR. DINESH CHANDRA SEN, D.Sc., P.R.S.

Sadhubaba Sri Sri Taracharan Paramhansadev & Sadhuma Sri Sri Aranya Kumari Devi— Voluntary Donation Rs. 8/-

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (হিন্দী)—শ্রীজয়দেব নারায়ণ সাহী মূল্য—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীতারামঠ, ৬৫, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তারাচরণ সত্যসঙ্ঘের পক্ষে 'সত্যসাথী মুদ্রণ', ৬বি, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সত্যসাথী কার্য্যালয় : ৬৫, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ Tel. No.2464-2099
Mob : No. 9748955894